পাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

লেখকের কয়েকখানি উপন্যাস

একালের মেয়ে, নারীর স্বর্গ, বান্ধবী, মন নিয়ে খেলা

দেব সাহিত্য

প্রকাশ করেছেন—
শ্রীসুবোধচন্দ্র মজুমদার
দেব সাহিত্য-কুটীর প্রাইভেট্ লিমিটেড্
২১, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

প্রথম প্রকাশ—
বৈশাখ
১৩৬৮

প্রচ্ছদপট এঁকেছেন—
শ্রীবলাই বন্ধু রায়

ব্লক করেছেন—
ন্যাশন্যাল হাফটোন কোম্পানী

ছেপেছেন—
এস্. সি. মজুমদার
দেব-প্রেস
২৪, ঝামাপুকুর লেন
কলিকাতা—৯

দাম—
তিন টাকা

উ...

প.... ....

হা.......................................

র................................

সুর ও বীণা

বেগমপুরের বড় তরফ সঞ্জীব রায়ের বৈঠকখানা।

বৈঠকখানার প্রকাণ্ড তক্তাপোশের ওপর দামী জাজিম, তার ওপর কতকগুলো বড় বড় তাকিয়া। দেয়ালে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড তৈলচিত্র, সেকালের বাঙলার নানা পালা-পার্বণের ছবি। এক কোণে কতকগুলি সড়কি ও বল্লম, স্ট্যাণ্ডে ছোট-বড় কতকগুলি বন্দুক। বড় বড় বাতিদানের আলোয় ঘরখানা আলো হয়ে আছে। চৌকীর ওপর সঞ্জীব রায় অর্ধশায়িত অবস্থায় বিশ্রাম করছিলেন। পাশেই রূপার প্রকাণ্ড আলবোলা, আলবোলার মাথায় তাওয়া সমেত রঙীন কল্কে। জরির নলটা সঞ্জীব চৌধুরীর হাতে। খাস চাকর নিমাই তাঁর পদসেবা করছে। বৈঠকখানা থেকেই ওপাশের গাড়ি-বারান্দার খানিকটা চোখে পড়ে। গাড়ি-বারান্দার পাশ দিয়ে মেহগনির কাঠের চওড়া সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। সিঁড়ির দেয়ালে ছবি থেকে শুরু করে ঢাল, সড়কি, বল্লম, জন্তু-জানোয়ারের মাথা, কোন কিছুরই অভাব নেই।

সঞ্জীব চৌধুরী কি যেন ভাবছিলেন চোখ বুঁজে। হঠাৎ আলবোলার নলটা নিমাইয়ের হাতে দিয়ে উঠে বসলেন, তারপর প্রশ্ন করলেন, 'রামচরণ এখনও ফেরেনি ?'

নিমাই ভয়ে ভয়ে একটা ঢোঁক গিলে জবাব দিলে, 'আজ্ঞে না কর্তামশাই। সাতটার গাড়িতে ফিরবেন বলেছিলেন, তা সাতটা তো...'

নিমাইয়ের কথা শেষ হবার আগেই বাইরে থেকে একজনের কণ্ঠ শোনা গেল, 'আসতে পারি রায়মশাই ?'

আধাবয়সী এক ভদ্রলোক ঘরে ঢুকে পায়ে হাত দিয়ে সঞ্জীবকে প্রণাম করলেন। বেশ মোটাসোটা দেখতে, মুখের ওপর একরাশ

কাঁচাপাকা গোঁফ। কড়া ইস্তিরি-করা শার্টের বোতাম-ঘর থেকে বুক-পকেট পর্যন্ত মোটা সোনার চেন—বলা বাহুল্য ঘড়ির।

সঞ্জীব বললেন, 'তারপর রায়বাহাদুর, হঠাৎ এদিকে পায়ের ধুলো পড়ল যে?'

রায়বাহাদুর বললেন, 'একটু বিশেষ দরকারে—'

সঞ্জীব বললেন, 'বিশেষ একটু দরকার না হলে কি আপনাদের মতন মহৎ ব্যক্তির দেখা মেলে? কিন্তু দাঁড়িয়ে রইলেন কেন? বসুন।'

রায়বাহাদুর বিচক্ষণ, বিষয়বুদ্ধি-সম্পন্ন লোক। কাজের কথা পাড়তে দেরি করলেন না। বসতে বসতে বললেন, 'হরিপুরের চরের দখলটা নিয়ে ভয়ানক অসুবিধেয় পড়া গেছে রায়মশাই। ওটা এতদিন আপনার বেয়াইমশাই ভোগদখল করে আসছিলেন। সম্প্রতি আমি হাইকোর্ট থেকে স্বপক্ষে ডিক্রি পেয়েছি। কিন্তু চৌধুরীমশাইয়ের পাইক-পেয়াদা কিছুতেই ওটার দখল নিতে দিচ্ছে না। আপনি অনুগ্রহ করে বেয়াইমশাইদের বলে দিলে হাঙ্গামাটা নিশ্চয়ই মিটে যায়।'

সঞ্জীব একটু চুপ করে থেকে বললেন, 'এটা কত সন বলুনতো রায়বাহাদুর?'

—'তেরশো তেতাল্লিশ।'

—'তেরশো চল্লিশ হলে আপনার অনুবোধ হয়তো রাখতে পারতাম। এখন আব হয় না।'

—'কেন বলুন তো?'

—'আমরা চিরকাল দু-তরফে মারামারি লাঠালাঠি করে এসেছি। কিন্তু আর কেন? সামাজিক একটা সম্বন্ধ যখন গড়ে উঠেছে তখন ওগুলো বন্ধ হওয়াই ভাল। তা ছাড়া জমিদারি হিসেবে বড় তরফ হলে কি হয়, সামাজিক সম্বন্ধের হিসেবে আমি মেয়ের বাবা।'

সঞ্জীব রায় কথাটা বলে হাসবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু সেটা ভাল

লাগল না। রায়বাহাদুরের মুখের ভাবেও নৈরাশ্য দেখা দিল। আরও কিছুক্ষণ তিনি বসে রইলেন বটে, কিন্তু আর কিছু বলবার সাহস খুঁজে পেলেন না। সঞ্জীব রায়ের হাসির মতন রাগটাও এমন হঠাৎ আর দুর্বার যে এ অঞ্চলের অধিকাংশ লোক সে কথা জানে, রায়বাহাদুরও জানেন। কাজেই তিনি আরও কিছুক্ষণ বসে অবান্তর কতকগুলো বিষয়ে দু-চারটে কথা বলে এক সময় উঠে চলে গেলেন।

নিমাই রায়বাহাদুরকে পথ দেখিয়ে দিতে গেল। পথ দেখাবার কোন প্রয়োজন ছিল না; কিন্তু ওটা এ বাড়ির দস্তুর। সঞ্জীবও ভিতব-বাড়িতে যাবার উপক্রম করছিলেন, এমন সময় রামচরণের প্রবেশ। জমিদার বাড়ির অনেক কালের নায়েব রামচরণ। উপরন্তু সঞ্জীব রায়ের ডান হাত, গোমস্তা মহলের সর্বেসর্বা। রামচরণ ঘরে ঢুকে কর্তামশাইকে সবিনয়ে নমস্কার করল।

সঞ্জীব বললেন, 'কলকাতায় গেলে যে আর ফেরবার নাম কর না হে?'

কিন্তু নিজের কাজে বামচরণেব দেরি হয়নি। ফেরবার পথে সে সঞ্জীবেরই বড় মেয়ে অরুণার সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিল। সেই খানেই দেবি হয়েছে। অরুণা সঞ্জীবকে চিঠি দিয়েছে; চিঠিখানা লিখতে দেবি হওয়াতেই রামচবণ বিকেলেব ট্রেনটা ধরতে পারেনি।

অরুণা চিঠি লিখেছে শুনেই সঞ্জীবের মুখের রুষ্ট ভাবটা যেন কোমল হয়ে এল।

- 'অরু চিঠি দিয়েছে? কই দেখি?'

রামচরণ চিঠিখানা বাব করে সঞ্জীবের হাতে দিল। খামের উপরকার শিরোনামাটুকু দেখতে দেখতে সঞ্জীব বললেন, 'হুস! আবার ইংরিজিতে বাপের নাম লেখা হয়েছে! কলেজে পড়ছে কিনা! নিমাই, চশমাটা দেতো—'

সুর ও বীণা

নিমাই শ্বেতপাথরের টেবিলের ওপর থেকে চশমাটা নিয়ে সঞ্জীবের হাতে দিল। সঞ্জীব চিঠি পড়তে লাগলেন। ধীরে ধীরে তাঁর মুখের প্রফুল্ল ভাবটা অন্তর্হিত হল, তার বদলে দেখা দিল বিরক্তি ও দুশ্চিন্তার চিহ্ন। পড়া শেষ করে সঞ্জীব হঠাৎ নিমাইয়ের দিকে চেয়ে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললেন, 'খড়মটা কোথায় রেখেছিস হতভাগা? এগিয়ে দে, আমি অন্দরে যাব।'

মনিবের এই আকস্মিক উত্তেজনার কারণ নিমাই বা রামচরণ কারও বোধগম্য হল না। গজদন্তের খড়মটা এনে নিমাই তাড়াতাড়ি সঞ্জীবের পায়ের কাছে রাখল। সঞ্জীব আর কোন কথা বললেন না। চিঠিখানা হাতে নিয়ে উঠে পড়লেন। তাঁর খড়মের আওয়াজে ভিতর ও বার-বাড়ির চাকর-বাকর, নায়েব-গোমস্তা সবাই সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল।

বড় তরফ ছেড়ে এবার আমাদের ছোট তরফের কথা কিছু বলে রাখতে হবে। জমিদার ভবশঙ্কর চৌধুরীর একমাত্র ছেলে শুভেন্দু নিজের ঘরে ড্রেসিং টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে চুল আঁচড়াতে ব্যস্ত। পরিপাটীভাবে ব্যাকব্রাস করে, শিস দিতে দিতে সিল্কের পাঞ্জাবিটা গায়ে চড়ালে। মাদ্রাজী উড়ুনিটা ফেললে কাঁধের ওপর। টেবিলের ওপর থেকে রিস্টওয়াচটা তুলে নিয়ে কবজিতে বাঁধল। খোলা জানালা দিয়ে এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে ড্রেসিং টেবিলটার ওপর পড়েছিল। শুভেন্দু কিছুক্ষণ অন্যমনস্ক ভাবে চেয়ে রইল বাইরের দিকে, তারপর দ্রুতপায়ে সিঁড়ি পার হয়ে নীচে নেমে এল। নীচের ঘরে ভবশঙ্কর প্রকাণ্ড সেক্রেটেরিয়েট টেবিলের সামনে বসে খাতাপত্র দেখছিলেন। বয়স পঞ্চাশ পার হয়েছে, মাথায় টাক, প্রকাণ্ড ভুঁড়ি। দস্তুর মতন বনেদী চেহারা।

শুভেন্দু ঘরে ঢুকে কোন রকম ভূমিকা না করেই বললে. 'আমি রায়বাড়ি যাচ্ছি বাবা।'

ভবশঙ্কর খাতাপত্র থেকে মুখ না তুলেই জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় ?'

—'রায়বাড়ি।'

ভবশঙ্কর এবার মুখ তুলে বললেন, 'কথাটা ঠিক বুঝতে পারলাম না শুভেন্দু। হঠাৎ সেখানে যাবার কি দরকার হল ?'

—'হঠাৎ নয়। যাওয়া অনেকদিন আগেই উচিত ছিল। আপনি অসন্তুষ্ট হবেন ভেবে এতদিন ইতস্ততঃ করছিলাম—'

—'হঠাৎ সংকোচটা কাটিয়ে উঠলে যে ?'

—'ভেবে দেখলাম, আপনার এই জেদের কোন মানে হয় না।'

—'অর্থাৎ আমার আপত্তি থাকলেও তুমি যাবে ?'

শুভেন্দু জবাব দিল না।

ভবশঙ্কর বললেন, 'সঞ্জীব মেয়ে পাঠাবেন না, এটা তুমি অপরাধ বলেই ধরলে না, আমার নিষেধটাই অন্যায় হল ? সঞ্জীব এদিককার সব চেয়ে বড় জমিদার হতে পারেন, কিন্তু তাঁর মর্জিমত চলতে অন্ততঃ আমি রাজী নই।'

—'এ-কথা আমাদের বিয়ের আগে আপনার ভাবা উচিত ছিল বাবা।'

ভবশঙ্কর রেগে উঠলেন, 'তোমার নির্লজ্জতায় আশ্চর্য হচ্ছি শুভেন্দু। তুমি আমার একমাত্র ছেলে হতে পার, কিন্তু তোমার সব রকম ঔদ্ধত্য আমি সহ্য করব না।'

শুভেন্দু দমল না। সোজা বাপের চোখের ওপর চোখ রেখে জবাব দিলে, 'আপনারা দু-তরফে চিরকাল মারামারি লাঠালাঠি করে এসেছেন। যে কোন মুহূর্তে বিরোধ আপনাদের মধ্যে আবার মাথা চাড়া দিয়ে উঠতে পারে। তবু এ বিয়েতে আপনি রাজী হলেন কেন ?'

ভবশঙ্কর বললেন, 'আমি মোটেই রাজী হইনি। তোমার মা

সঞ্জীবের ছোট মেয়েটিকে দেখে হঠাৎ ছেলের বউ করবার জন্যে পাগল হয়ে উঠেছিলেন। এমন জেদ ধরলেন যে শেষ পর্যন্ত আমাকে…'

ভবশঙ্করের কথা শেষ হবার আগেই শুভেন্দু বললে, 'সঞ্জীব রায়ের দুটি মাত্র মেয়ে, ছেলে একটিও নেই। তাঁর একটি মেয়ের সঙ্গে ছেলের বিয়ে দিতে পারলে রায়বাড়ির অর্ধেক সম্পত্তিতে চৌধুরীদের অধিকার জন্মাবে, এই ভেবে বোধ হয় আপনিও আপত্তি করতে পারেননি।'

ভবশঙ্কর চমকে উঠলেন। তাঁর মনের অনুচ্চারিত কথাটা হয়ত অনেকটা এই রকমই ছিল, কিন্তু তার জন্যে ছেলের কাছে জবাবদিহি করতে হবে?

ভবশঙ্কর বললেন, 'কথাটা ঠিক তা নয়। তোমার মায়ের আগ্রহ আর…'

শুভেন্দু এবারও তাঁকে কথাটা শেষ করতে দিল না, বললে, 'মা আজ বেঁচে নেই, তাঁর সম্বন্ধে কোন কথা বলা আমাদের কারও পক্ষেই উচিত হবে না। কিন্তু আপনি আছেন। আমি তাই আপনাকে বলতে এসেছি যে বরুণাকে পাঠাতে যদি তাঁবা রাজী না হন তাহলে আমি এখন দিনকতক বেগমপুরে গিয়েই থাকব। আপনাদের বনেদী ঝগড়া আর ঝামেলার জন্যে আমি নিজে ঠকতে রাজী নই।'

একালেব লেখাপড়া-জানা ছেলে শুভেন্দু অসম্ভব জেদী আর স্বাধীনচেতা। ভবশঙ্কর এটা বিলক্ষণ জানতেন। তবু এত বড় কথাটা তিনি ছেলের মুখে আশা করেননি। ক্রোধে ও ক্ষোভে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে তিনি বললেন, 'এ কথা তুমি বলতে পারলে শুভেন্দু?'

—'আমায় আপনি ক্ষমা করবেন। কিন্তু আমার শিক্ষা-দীক্ষা আমাকে ঝগড়াঝাঁটি আর খুনখারাপিকেই জীবনের সবচেয়ে বড় আনন্দ বলে মেনে নিতে শেখায়নি। এসব ছাড়াও জীবনের অনেক দিক্ আছে বাবা—'

সুর ও বীণা

—'থাম থাম!'—ধমকে উঠলেন ভবশঙ্কর, 'চৌধুরী-বাড়ির ছেলে শেষে রায়েদের ঘরজামাই হবে! এ অপমান…'

শুভেন্দু বললে, 'আমার ওপব এটুকু বিশ্বাস আপনি রাখবেন। সম্মানে আঘাত লাগলে কোন আকর্ষণই আমাকে সেখানে আটকে রাখতে পারবে না।'

শুভেন্দু নীচু হয়ে ভবশঙ্করেব পায়ের ধুলো নিতে গেল। ভবশঙ্কর পা সরিয়ে নিলেন।

শুভেন্দু হেসে ফেলল। হাসতে হাসতেই বললে, 'আপনি মন খারাপ্ কববেন না বাবা, পৃথিবীটা মিনিটে মিনিটে বদলে যাচ্ছে। আপনাবা দু-পক্ষই যদি এ কথা মনে রাখেন তাহলেই আর কোন ঝামেলা থাববে না।'

ভবশঙ্কর তখনও মুখভার কবে বসে রইলেন।

শুভেন্দু ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। বাইবে চৌধুরী-বাড়ির টমটম তৈরী ছিল। শুভেন্দু উঠে বসল। মিনিট খানেকের মধ্যেই ঘোড়ার খুরের টগবগ শব্দে জ্যোৎস্না-মাখানো গ্রাম-পথ মুখর হয়ে উঠল। সে শব্দ মিলিয়ে যেতে ভবশঙ্কব উঠে দাঁড়ালেন। বুক খালি করে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে এল। মনে হল, সঞ্জীব রায় এতদিনে যা পারেননি, সঞ্জীবের মেয়ে দু' বছরের মধ্যে তা করে ফেলেছে।

তিনি হেরে গেছেন।

রায়েদের কাছে চৌধুরীরা হেরে গেছে।

সঞ্জীব রায় এবং ভবশঙ্কর চৌধুবীর এই হার-জিতের এই পটভূমিকে আর একটু খুলে বলতে পারলে এই কাহিনীর পরের কথাগুলো বোঝবার পক্ষে অনেক সুবিধে হতে পারে। তাই গোড়ার কথাটা এখানে একটু বলে রাখি।

সুর ও বীণা

বাঙলা দেশের এই দুটি কায়স্থ পরিবার নবাবী আমলের পড়তি অবস্থায় পাশাপাশি থেকে বড় হয়ে উঠেছিল। রায়বাড়ি আর চৌধুরী-বাড়ির মধ্যে তফাত শুধু মাইল তিনেক রাস্তা। তাই এক পক্ষের বড় হয়ে ওঠাটা যদি আর এক পক্ষের কাছে মস্ত বড় অপরাধ বলে মনে হয়ে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কোন কারণ নেই। বাঙলা দেশের মাটি যেখান থেকে শ্যামল রং হারিয়ে ধূসর ও বিবর্ণ হতে শুরু করেছে, এই দুই পরিবারের বাস তারই খুব কাছাকাছি। ভৌগোলিক সীমায় দেশটা বাঙলা সন্দেহ নেই, কিন্তু পশ্চিমের আবহাওয়া এসে লেগেছে তার গায়ে। শুধু জল-বাতাসেই নয়, জল-বাতাস যাদের দেহে প্রাণসঞ্চার করে তাদের মধ্যেও। দুইপক্ষের অধিকাংশ পাইক-পেয়াদাই পশ্চিমা লোক, কিংবা কোল-ভিল-সাঁওতাল, যারা ছাতু আঁটতে আর লাঠি ঘোরাতে সমান ওস্তাদ। বর্তমান জমিদারের পূর্বপুরুষদের আমলে তার পরিচয় এরা ভাল ভাবেই দিয়েছে। কবে এক অন্ধকার রাত্রে বড় তরফের শ' দেড়েক পাইক গিয়ে চৌধুরীদের একটি বিল রাতারাতি ভরাট করে দিয়েছিল, চৌধুরীদের পূর্বপুরুষদের কেউ একজন খাঁটি ফরাসী প্রথায় রায়বংশের একজন কর্তাকে ডুয়েলে চ্যালেঞ্জ করেছিল, সে সব কথা এখনও প্রবীণ গ্রামবাসীদের মুখে মুখে শোনা যায়। কিন্তু এখন সেগুলি যেন নিতান্তই খোসগল্পের উপাদান। ছোট তরফের ভবশঙ্কর চৌধুরী শেষ বয়সে কলকাতায় গিয়ে ব্যবসা ফেঁদে রাশি রাশি টাকা উপার্জন করেছেন; একমাত্র ছেলে শুভেন্দুকে কলকাতার হোস্টেলে রেখে এম-এ পড়িয়েছেন; জমিদারি এখনও পুরোপুরি বজায় থাকলেও, জমিদারির উপস্বত্বটাই তাঁর একমাত্র নির্ভর নয়। তিনি বেশির ভাগ কলকাতায় থাকেন, মাঝে মাঝে সপ্তাহের শেষ দিকে দুই একদিনের জন্যে বাড়ি আসেন। কিন্তু সাবেক কালের সেই নীল রক্ত এখনও ধমনীতে ঠিক আগের মতই বইছে। সুযোগ পেলে দাঙ্গা-হাঙ্গামা বাধাতে পিছু পাও হন না, বরং

তাতে বিচিত্র একটা উত্তেজনা অনুভব করে থাকেন। প্রথম বয়সে সঞ্জীবের সঙ্গে গোলমালও বাধিয়েছেন কয়েকবার। কিন্তু সময়ের ঝড়ো হাওয়ায় সেই আগের দিনের স্মৃতির আবর্জনাগুলো আজ উড়ে গিয়ে অনেক দূরে পড়েছে। আর এই ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী সাহায্য করে গেছেন ভবশঙ্করের স্ত্রী, শুভেন্দুর মা। কী একটা যোগ উপলক্ষে গঙ্গাস্নানে গিয়ে তিনি সঞ্জীব রায়ের ছোট মেয়ে বরুণাকে দেখে একেবারে মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন। বরুণাকে দেখে শুভেন্দুর মার মনে হয়েছিল, এ মেয়েটির নাম যেন বরুণা না হয়ে গৌরী বা উমা হওয়া উচিত ছিল। এই রকম একটা নামের ওপর মেয়েটির অধিকার যেন জন্ম-জন্মান্তরের। সত্যিই যেন কোন মহাকাব্যের নায়িকা দুরূহ তপস্যা শেষ করে সেদিন তাঁর সামনে এসে দাঁড়িয়েছিল।

বাড়ি ফিরেই তিনি মনের কথাটা ভবশঙ্করকে জানিয়েছিলেন।

ভবশঙ্কর বলেছিলেন, 'অসম্ভব! বড় তরফের সঞ্জীব রায় এতে রাজী হতেই পারেন না।'

নগদ টাকার হিসেবে ভবশঙ্কর আজ হয়তো পিছিয়ে পড়বেন না, কিন্তু খ্যাতি-প্রতিপত্তির দিক্ থেকে দু-তরফে তফাত যে অনেকখানি, সেটা ভবশঙ্কর মনে মনে ভাল করেই জানতেন। কিন্তু সংসারে কখনও কখনও অতি দুরূহ সমস্যার সমাধান খুব সহজে হয়ে যায়। এ ব্যাপারেও ঘটেছিল ঠিক তাই।

জমিদার সঞ্জীব রায় কেবল জবরদস্ত জমিদার নন, তাঁর সম্ভ্রম-বোধটাও অসাধারণ। যৌবনকালে ছোটলাটকে তিনি একবার এই বেগমপুরেই ভোজ দিয়েছিলেন। সেই ভোজসভায় কলকাতা থেকে ফিরিঙ্গি মেয়েরা এসেছিল, বাছাই-করা ফরাসী মদের স্রোত বয়েছিল এবং বিশেষ করে ভোজের জন্যেই উপরে একটা প্রকাণ্ড ডাইনিং-হল তৈরি করা হয়েছিল চীনে কারিগরদের দিয়ে। মেহগনি কাঠের সিঁড়িটাও নাকি সেই সময়ের। বড়দিনের সময় জেলা ম্যাজিস্ট্রেট

থেকে শুরু করে বিভাগীয় কমিশনার পর্যন্ত অনেকেরই বুটের ধুলোয় রায়বাড়ির এই ডাইনিং-হলের মর্যাদাবৃদ্ধি হত। অথচ মজার ব্যাপার এই যে, সঞ্জীব নিজে এই সব ব্যাপার থেকে একেবারে সন্ন্যাসীর মতন নির্লিপ্ত থাকতেন। তেত্রিশ বৎসর বয়সে সঞ্জীবের স্ত্রী মারা গিয়েছিলেন। সকলেই আশা করেছিল তিনি আবার বিয়ে করবেন, কিংবা রায়বাড়ির নালা-নবদমায় মদের ঢেউ বইবে। কিন্তু সে রকম কিছুই ঘটল না। হঠাৎ তিনি হরিদ্বার থেকে একজন বৈদান্তিককে আনিয়ে দীক্ষা নিয়ে ফেললেন। সঞ্জীবের বড় মেয়ে অরুণা ছেলেবেলা থেকেই একটু স্বাধীনভাবের মেয়ে। মার মৃত্যুর সময় সে একটু বড়ও হয়েছিল, কিন্তু ছোট মেয়ে বরুণা তখন একেবারে ছোট। বাইরের লোকে জানতো, বরুণা গভর্নেসের কাছে মানুষ হচ্ছে, কিন্তু গভর্নেসের তুলনায় সঞ্জীবের স্নেহ-যত্নের ওপরেই বরুণা ভাগ বসিয়েছিল একটু বেশী মাত্রায়। অরুণা প্রতিদিন মোটর চড়ে আসানসোলের স্কুলে পড়তে যেত, বরুণার মাস্টারী করতেন সঞ্জীব নিজে। আসানসোল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে অরুণা কলকাতায় পড়তে গেল সঞ্জীবের এক দূরসম্পর্কীয়া বোনের বাড়িতে থেকে; সঞ্জীব সদর থেকে পণ্ডিত এনে বরুণার সংস্কৃত পড়ার ব্যবস্থা করলেন। লোকে বলতে লাগলো, রায়মশাই ছোট মেয়েটিকে ভালবাসেন বেশী। আহা, তা হবেই তো। অল্প বয়সে মা-মরা মেয়ে।

সেই মেয়ের সঙ্গে চৌধুরী-বাড়ির ছেলের বিয়ে।

সঞ্জীব রায় রাজী হবেন একথা কেউ ভাবেনি। অথচ প্রস্তাবটা রায়বাড়িতে পৌঁছবার দিন তিনেক পরেই তিনি রাজী হয়ে গেলেন। সে তল্লাটের লোকজনের মধ্যে যে একথা শুনলো সেই অবাক্ হয়ে গেল। কেউ বললে, রায়বংশের নাম ডুবলো। কেউ বললে, চৌধুরী-মশায়ের একটি মাত্র ছেলে। মেয়ের সঙ্গে তার বিয়ে দিয়ে রায়মশাই মস্ত একটা দাঁও মারলেন। কিন্তু আসল ব্যাপারটা ছিল অন্য রকম।

সুর ও বীণা

চৌধুরী-বাড়ি থেকে বরুণার বিয়ের প্রস্তাবটা আসতে সঞ্জীবের বুকে যেন মস্ত একটা ধাক্কা লেগেছিল। মেয়ের বিয়ে দিতে হয় একথাটা তাঁর যেন মনেই ছিল না। কিন্তু জবরদস্ত জমিদার হলেও তার মেয়ের বিয়ে দিতে হয়। পৃথিবীতে সাধারণতঃ এই রকমই ঘটে থাকে। সঞ্জীবেরও রেহাই নেই। যদি তাই করতে হয়, তাহলে অযাচিতভাবে যে প্রস্তাবটা এসেছে সেইটেই তো ভাল। মেয়েটি কাছাকাছি শ্বশুরবাড়িতে থাকবে; মন কেমন করলেই তাকে আনিয়ে নিতে পারবেন, সেও যখন-খুশি আসা-যাওয়া করতে পারবে।

এই সব ভেবে সঞ্জীব রাজী হয়ে গেলেন। বড় মেয়ের বিয়ের আগেই ছোট মেয়েটির বিয়ে দেওয়া স্থির করলেন। তারপর একদিন এক বসন্ত রাত্রির শুভ লগ্নে বরুণার বিয়ে হয়ে গেল এবং তারপর দিন সে চলে গেল শ্বশুরবাড়ি। বাড়িতে উৎসব-কোলাহল তখনও থামেনি, নহবতখানা থেকে ভেসে এসে করুণ একটা রাগিণী বাতাসকে বিহ্বল করে তুলছিল। সঞ্জীব হঠাৎ চীৎকার করে বাজনা বন্ধ করে দিতে বলেছিলেন। কাছে থাকতে বরুণা যে তাঁর মনের কতটা অধিকার করে বসেছিল সেটা যেন বরুণা চলে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তিনি বুঝতে পারলেন।

কোনরকমে মাস দুই কাটলো।

তারপর সঞ্জীব রামচরণকে ডেকে বললেন, 'বেইমশাইকে একখানা পত্র লেখ।'

পত্রের মর্মটা কি রকম হবে তাও তিনি বলে দিলেন। বরুণাকে কালই পাঠিয়ে দিতে হবে এবং ভবিষ্যতে সে এইখানেই থাকবে। শুভেন্দু তাঁর জামাই; সুতরাং সে যখন খুশি, যতদিন খুশি এখানে এসে থাকতে পারে। রায়বাড়িতে শুভেন্দুর অধিকার সঞ্জীবের চেয়ে কম নয়।

চিঠিখানা পড়ে ভবশঙ্কর চৌধুরী এমন বিজ্ঞভাবে হেসেছিলেন যেন

তিনি সব বুঝে ফেলেছেন। সঞ্জীব হয় তাঁকে অপমান করবার কিংবা শুভেন্দুকে 'হাত' করবার চেষ্টা করছেন। এতে আর ভুল নেই। ভবশঙ্করের নীল রক্ত যেন অনেকদিন পরে টগবগ করে ফুটে উঠল। বরুণাকে তিনি রায়বাড়িতে পাঠিয়ে দিলেন, কিন্তু শুভেন্দুকে সেখানে যেতে মানা করে দিলেন।

বিগতদর্প সঞ্জীব রায়ের অন্ধ পিতৃস্নেহকে শুভেন্দু ছাড়া সবাই ভুল বুঝলো।

রায়বাড়ির অন্দরমহলে বরুণা তার ঘরের খাটে বসে কার্পেটে ফুল তুলছিল। জানালার পাশেই নারিকেল গাছের পাতাগুলো বাতাসে দুলছে, এক ঝলক জ্যোৎস্না এসে পড়েছে সেগুলোর ওপর। ঘরের দরজায় নেটের পর্দা ঝুলছিল, সেটা সরিয়ে মূর্তিমান বিস্ময়ের মতন ঘরে ঢুকল শুভেন্দু। পায়ের শব্দে চোখ তুলে চেয়েই বরুণা ভয়ানক চমকে উঠলো, হাতের সুচটা ফুটে গেল আঙুলে। শুভেন্দু দ্রুত পদক্ষেপে এগিয়ে এসে নাটকীয় ভঙ্গীতে বরুণার হাতখানা ধরে ফেলল; তারপর বললে, 'ঘরে ঢুকতে না ঢুকতেই রক্তপাত! জানি, আমাকে দেখলে তোমার মাথার ঠিক থাকে না।'

বরুণার আঙুলগুলো সে নিজের ঠোঁটের কাছে নিয়ে যাবার চেষ্টা করল। বরুণা অপর হাতটি দিয়ে তাড়াতাড়ি মাথায় কাপড় তুলে দিতে দিতে বলল, 'কী যে করো তার ঠিক নেই! দরজা খোলা, এখুনি কেউ এসে পড়বে—'

- 'আসুক। আমি ট্রেসপাসের চার্জ আনবো।'

—'আপাততঃ সে অভিযোগটা কিন্তু আমিই করতে পারি। বলা নেই কওয়া নেই, হঠাৎ চোরের মতন পা টিপে টিপে ঘরে ঢুকলে যে?'

—'ভেবেছিলাম, চিঠি দিয়ে ডাকাতি করতে আসবো। কিন্তু সময় পেলাম না। সন্ধ্যের খানিক পরে বাগানে বেড়াতে বেড়াতে পূর্ণিমার

চাঁদটা মাথায় উৎপাত বাধিয়ে দিলে। গাড়ি তৈরি করে বিনা নোটিসে চলে এলাম।'

বরুণার মুখে যেন আশঙ্কার একটা ছায়া।

—'কিন্তু, তোমার বাবা হয় তো রাগ করবেন।'

—'নিশ্চয়ই করবেন। করবেন কেন, করেছেন। আমি তার জন্যে ভাবিনে। তাঁকে স্পষ্টই জানিয়ে এসেছি, আমার ব্যক্তিস্বাধীনতা আমি ক্ষুণ্ণ হতে দেব না। কিন্তু তুমি কী আশ্চর্য ঠাণ্ডা মেয়ে বরুণা, আমি রোমিওর মতন কত বাধা এড়িয়ে তোমার ঘরে এসে পৌঁছলাম, তুমি কোথায় আমার কণ্ঠবেষ্টন করে বলবে: রোমিও; রোমিও; কোথা হতে এলে তুমি রোমিও? তা নয়, বাবা কি বলবেন সেই ভাবনাটাই তোমার কাছে বড় হল?'

—'সবাই কি তোমার মতন কবিতা বলতে পারে?'—বলতে বলতে বরুণা অভিমানের ভঙ্গীতে মুখটা ফিরিয়ে নিলে।

শুভেন্দু যাত্রার দলের নায়কের মতন দুই বাহু বিস্তার করে বলে উঠল, 'তুমিই তো আমার কবিতা—একেবারে জীবন্ত, pulsating. তুমি আবার কবিতা বলতে যাবে কেন?'

বরুণার মাথার কাপড়টুকু জোর করে নামিয়ে দিতে দিতে শুভেন্দু বললে, 'এই সেকেলে ঢংগুলো আমি কিছুতে সইতে পারিনে। আমি এলাম তোমায় দেখতে, তুমি মাথায় কাপড তুলে দিয়ে মুখ ফিরিয়ে বসে রইলে। দেশে কামাল পাশার মতন একজন নেতা দরকার, যিনি জোর করে হুকুম দেবেন—off with ঘোমটা। উতারো নেকাব।'

বরুণা তবু জোর করে মাথায় কাপড় তুলে দেবার চেষ্টা করতে লাগল আর শুভেন্দু বার বার সে চেষ্টা পণ্ড করতে লাগল নানা কৌশলে। এমন সময় ঘরের বাইরে মার্বেলমণ্ডিত বারান্দায় সঞ্জীব রায়ের খড়মের শব্দ শোনা গেল।

বরুণা সন্ত্রস্ত কণ্ঠে বললে, 'তোমার ছুটি পায়ে পড়ছি, ছাড়ো। বাবা আসছেন।'

শুভেন্দুও মুহূর্তের মধ্যে শান্তশিষ্ট ছেলেটির মতন খাটের কাছ থেকে সরে গিয়ে একটা চেয়ারে বসে পড়ল।

পর্দা সরিয়ে সঞ্জীব ঘরে ঢুকলেন।

শুভেন্দু চেয়ার থেকে উঠে এগিয়ে এসে তাঁকে প্রণাম করল।

অরুণার চিঠিখানা ছোট মেয়েকে দেখাবার জন্যে এসেছিলেন সঞ্জীব। সামনে শুভেন্দুকে দেখে আনন্দিত হলেন যতখানি, তার চেয়ে তিনি আশ্চর্য হলেন বেশী। শুভেন্দু সোজা অন্দরে ঢুকে উপরে এসেছে পিছনের দরজা দিয়ে; তাঁর সঙ্গে দেখাও করেনি। কিন্তু সে জন্যে ক্ষোভ করবার বয়স সঞ্জীবের নয়। তিনি একটু বিব্রত ভাবেই বললেন, 'ব্যাপার কি বাবা শুভেন্দু? তুমি কতক্ষণ?'

—'এই মাত্র।'

—'বেশ করেছ, খাসা করেছ। যখন খুশি চলে আসবে। আমি তো ভেবে অস্থির হচ্ছিলাম, তোমার বাবার পায়ে না ধরিয়ে তুমি ছাড়বে না।'

—'আজ্ঞে না। আমি এখন কিছুদিন এইখানেই থাকব।'

—'যতদিন খুশি থাকবে। এ সব সম্পত্তি, বাড়ি-ঘর কার? তোমরা না ভোগ করলে কে ভোগ করবে?'

সঞ্জীব খাটের ওপব বসলেন। একটু চুপ করে থেকে বরুণার দিকে চেয়ে বললেন, 'এদিকে একটা ভারি গোলমেলে ব্যাপার হতে চলেছে মা। রামচরণ ব্যাঙ্কের কাজে কলকাতায় গিয়েছিল। তোমার দিদি তাব হাতে একখানা চিঠি লিখে পাঠিয়েছেন। চিঠির বক্তব্য এই যে গ্রীষ্মের ছুটিতে এবার তিনি বাড়ি আসতে পারবেন না, সিমলা পাহাড়ে হাওয়া খেতে যাবেন। তার বন্ধু কৃষ্ণা না কাব কাকীমা থাকেন বুঝি সেখানে। কাজেই ভাববার আর কিছু নেই। কিন্তু এ

কখনও হতে পারে না। আমি তোমাদের বলে রাখলাম। তুমি এ সম্বন্ধে কি বল শুভেন্দু?'

—'আপনার সঙ্গে আমার মত হয়তো মিলবে না।'

—'না মিলুক, শুনে রাখতে ক্ষতি কি।'

—'আমার মতে, ছুটি-ছাটাতে বাইরে ঘুরে আসাটা খারাপ নয়। তাতে অনেক জিনিস শেখা হয়।'

—'ও সব বড় কথা আমি বুঝি না বাবা। আমি এইটুকু বুঝি যে এ বাড়ির কোন মেয়ে এ পর্যন্ত ঠিক এইভাবে চলাফেরা করেনি।'

—'দিনকাল তো বদলে যাচ্ছে। করলে ক্ষতি কি?'

—'ক্ষতি যে হবেই এমন কথা বলছি না। তেমনি ক্ষতি যে হবে না এ কথাও তো জোর করে বলতে পারবো না। তা ছাড়া আমি তর্ক ভালবাসিনে শুভেন্দু, সোজাসুজি যেটা ভাল বুঝি সেইটেই করি।'

আপনাদের মনে হতে পারে এর পর অরুণার নিশ্চয়ই সিমলা পাহাড়ে যাওয়া হয়নি। কিন্তু না, অরুণা সত্যিই সিমলা পাহাড়ের হাওয়া খেতে গিয়েছিল। অন্যান্য ক্ষেত্রে যেমন, এক্ষেত্রেও তেমনি, বড় মেয়েটিকে দুঁদে জমিদার সঞ্জীব রায় এঁটে উঠতে পারেননি। বরুণাকে দিয়ে সঞ্জীব প্রথম যে চিঠিখানা লিখিয়েছিলেন তার জবাবে অরুণা আর একখানা পত্র দিয়েছিল। তাতে দীর্ঘ যুক্তির অবতারণা ছিল। সেই পত্রের উত্তরে সঞ্জীব জানিয়েছিলেন: যেতে হয় যাও, যা খুশি তাই কর। তুমি যখন এই বয়স পর্যন্ত বিয়ে করতেই রাজী হওনি, তখন আমি তোমার কাছে বেশী কিছু আশা করি না। তবে উপযুক্ত গরম জামা-কাপড় সঙ্গে নিয়ে যেও এবং টাকাকড়ির অভাব পড়লেই তার কোরো।

শুভেন্দুর এতে পুরোমাত্রায় সমর্থন ছিল, বলাই বাহুল্য।

বরুণা পরিহাস করে বলেছিল, 'বাইরে না গেলে যদি কিছু

শেখাই না হয়, তা হলে আমি তো নিতান্ত সেকেলে। বড় শহর পর্যন্ত আমি কোন দিন দেখিনি।'

শুভেন্দু জবাব দিয়েছিল, 'প্রত্যেক নিয়মের ব্যতিক্রম থাকা চাই। তা ছাড়া, বিয়ের আগের নিয়ম এক, পরের নিয়ম অন্য। বিয়ের পর সব মেয়েরই সব সময় পতি-পরমদেবতার কাছাকাছি থাকা চাই। 'আমি নিশিদিন তোমায় ভালবাসি তুমি অবসর মত বসিও'— রবি ঠাকুরের এই থিওরিটা আমি মানতে রাজী নই। আর একটা কথা কি জানো? সব সেকেলে জিনিসই খারাপ নয়। ভালবাসাটা নিতান্তই সেকেলে।'

কৃষ্ণার কাকা মিস্টার ঘোষ সিমলা পাহাড়ে বড় চাকরি করতেন। ছুটি পেলেই কৃষ্ণা সেখানে পালাত এবং ফিরে এসে সেখানকার মেঘ-বৃষ্টি-রৌদ্রের চমৎকার, লোভনীয় বিবরণ দাখিল করে সহপাঠিনীদের মন ঈর্ষাতুর করে তুলত। অরুণাকে সে বহুবার সেখানে যাবার জন্যে অনুরোধ করেছে, অরুণা রাজী হয়নি। কিন্তু এবার কী যে হল, কৃষ্ণা অনুরোধ করতেই অরুণা রাজী হয়ে গেল। চিরকাল সে বই-খাতা, লাইব্রেরী, ডিবেটিং সোসাইটি নিয়ে কাটিয়েছে, ছুটির সময় দেশে গিয়ে মোটর হাঁকিয়ে, ঝিলে বাচ খেলে, দুর্গম কোন জায়গায় বনভোজনের আয়োজন করে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে অস্থির করে তুলেছে। কিন্তু এবার সে যেন মনে মনে নতুন কিছু একটা করবার জন্যে লালায়িত হয়ে উঠেছিল। কাজেই কৃষ্ণা যখন প্রতিবারের মতন তাকে সিমলা পাহাড়টা দেখে আসবার জন্যে অনুরোধ করল, অরুণা তখন এক কথায় রাজী হয়ে গিয়ে সবাইকে অবাক্ করে দিল।

সিমলায় এসে অরুণা যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। এখানকার আকাশ নবপরিণীতা বধূর মতন সব সময় মুখ ঢেকে থাকে আর সেই ঘোমটার মধ্যেই অভিমান-উদ্গত চোখে কথায় কথায় জল ঝরে পড়ে।

বাঙলার প্রচণ্ড বর্ষণের সঙ্গে এর মিল নেই ; বর্ষা এখানে কলরব করে না ; মেঘের মতই নিঃশব্দে চলাফেরা করে। অরুণার সমস্ত মন যেন জুড়িয়ে গেল। কৃষ্ণাকে সঙ্গে নিয়ে সে প্রথম কটা দিন এখানে-সেখানে চারিদিকে যা কিছু দেখবার ছিল সেগুলো দেখে ফেলল। তারপর, কৃষ্ণাকে না পেলে একাই বেড়াতে শুরু করল। বেড়াবার বাতিকটা যেমন উগ্র থেকে উগ্রতর হতে লাগল, তেমনই জানা না-জানা কত গানই যে দিনরাত মধুমক্ষিকার মতন তার মনের মধ্যে গুঞ্জন শুরু করল তারও কোন লেখা-জোখা নেই।

অরুণা সেদিন মিঃ ঘোষের বাংলোর ড্রয়িংরুমে বসে গান গাইছে। মিসেস ঘোষ ওরফে শ্রীমতী প্রীতিলতা নিকটেই একটা সোফা দখল করে বসে আছেন। কৃষ্ণা পিয়ানোর পাশে দাঁড়িয়ে রীডগুলোর ওপব অরুণার আঙুলগুলোব দ্রুতগতি দেখে মুগ্ধ হয়ে যাচ্ছিল।

অরুণা গাইছিল ঃ

> একলা পথে যেতে যেতে নিভেছে মোর বাতি,
> ঝড় এসেছে গো, আজ ঝড়কে পেলাম সাথী।

প্রীতিলতার জীবনের সবচেয়ে বড় লক্ষ্য সামাজিকতা। নিজেকে তিনি বাঙলা এবং হিন্দিগানের মস্ত বড় সমঝদার বলে মনে করেন।

গান শেষ হতে প্রীতিলতা বললেন, 'এমন সৃষ্টিছাড়া গান কেন বে অরুণা ? এখানে আর ভাল লাগছে না বুঝি ?'

মিউজিক টুল থেকে উঠে দাঁড়াতে দাঁড়াতে অরুণা বললে, 'খুব ভাল লাগছে কাকীমা, ভয়ানক ভাল লাগছে। মনে হচ্ছে, এত ভাল লাগা বুঝি ভাল নয়।'

কৃষ্ণা পরিহাসচ্ছলে বললে, 'আমাব ধারণা বিন্তু অন্যরকম—'

প্রীতিলতা কৌতূহলী কণ্ঠে বললেন, 'কি বলতো ?'

অরুণা কৃষ্ণাকে চোখে চোখে মানা কবল। কিন্তু কৃষ্ণা শুনল না। সে বললে, ও ভেবেছিল হয় স্কুলের মাস্টারনী কিংবা লেডী ডাক্তার

হবে। বিয়ে করবে না, চিরকাল একা একাই কাটিয়ে দেবে। কিন্তু এখানে এসে অবধি ওর যেন সব গণ্ডগোল হয়ে যাচ্ছে।'

প্রীতিলতা হাসতে হাসতে বললেন, 'অমন অদ্ভুত কত আইডিয়া আমাদেরও ছিল। এখন শবীরের এই অবস্থার দিকে চাইলে সে সব ভেবে নিজেরই হাসি পায়।'

অরুণা এবং কৃষ্ণা দুজনেই হাসছে দেখে তিনি আবার বললেন, 'না না, হাসির কথা নয়। জীবনে আদর্শ থাকা খুব ভাল, কিন্তু সংসারে টিকতে গেলে রফা না করে লাভ নেই। থাক ও সব বড় কথা, এবার তুই একখানা গান গা দেখি মা কৃষ্ণা—'

অরুণার গানের পব কৃষ্ণার গান জমতেই পারে না, কৃষ্ণা বেঁকে বসল।

প্রীতিলতা বিবক্ত হয়ে বললেন, 'তোমাদের—মানে আজকালকার মেয়েদেব এই একটা দোষ কৃষ্ণা। সহজ কথায় তোমাদের কিছুতেই রাজী করানো যায় না। জীবনে খালি শিক্ষিত হওয়াটাই বড় কথা নয়, সেই সঙ্গে সামাজিক হওযাও দরকার।'

আর কথা কাটাকাটি না করে কৃষ্ণা পিয়ানোর কাছে গিয়ে বসল। সবে সুবেব ঝংকার তুলেছে, বেয়ারা এসে প্রীতিলতাকে সেলাম করল।

সাহেব সেলাম দিয়েছেন।

শারীরিক স্থূলতার জন্য প্রীতিলতা একজায়গায় বসলে আর উঠতে চান না। তিনি উঠতে উঠতে বললেন, 'সাহেবের আর কি বলো, সেলাম দিতে তো আর মেহনত নেই—'

বিরক্ত হয়ে তিনি ঘোষ সাহেবের ঘবের দিকে এগিয়ে গেলেন।

প্রীতিলতা চলে যেতেই অরুণা কৃষ্ণার দিকে চেয়ে বললে, 'তোর জন্যেই আমাকে সিমলে ছেড়ে পালাতে হবে—'

কৃষ্ণা বললে, 'বারে। আমি কি দোষ করলাম। তুই-ই তো

কদিন ধরে গুনগুন করছিস—'জানি না কি নন্দন রাগে, সুখে উৎসুক যৌবন জাগে', মানে—পাত পেতে বসে আছি, এখন জুটো খেতে পেলেই হয়।'

অরুণা বললে, 'ভয় নেই তোর। সিমলার মেঘ-বৃষ্টি আর পাইন বনের হাওয়া ভাল লাগলেও আমি মনটাকে আপেল-নাসপাতির মতন সস্তা দরে ফিরি করতে রাজী নই।'

কৃষ্ণার কাকা ঘোষ সাহেব তাঁর ঘরে ইজিচেয়ারে বসে বই পড়ছিলেন। মুখে লম্বা পাইপ। প্রীতিলতা ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ারের হাতল থেকে একখানা টেলিগ্রাম তুলে স্ত্রীর হাতে দিলেন।

—'কার টেলি গো?'

—'তোমার ভাই অনিল বোস।'

—'অনিল! বিলেত থেকে ফিরলো কবে?'

—'সে কথা টেলিতে লেখেননি, তাতে খরচা বেড়ে যেত। তবে স্বয়ং এসে সব কথা জানাবার ভরসা দিয়েছেন।'

—'তা হলে আসবে বলে তার করেছে বলো?'

—'নইলে কি কেউ কুশল প্রশ্নের জন্য আজকাল টেলিগ্রাম করে?'

—'তোমার আপত্তি থাকে তো বারণ করে দাও—ঠিকানা দেয়নি?'

—'দিয়েছেন। গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে। কিন্তু নেহাত যখন তোমার দূর-সম্পর্কের হলেও পিসতুত ভাই, তখন আর বারণ করে মনস্তাপ কুড়োতে চাইনে। উপদ্রবটা একটু কম হলেই চলবে।'

মিস্টার ঘোষ আবার পাইপে মন দিলেন। তিনি স্বভাবতঃ শান্তিপ্রিয়, নিরীহ প্রকৃতির লোক, কথাবার্তা বলেন কম। কাজেই প্রীতিলতা আর কোন কথা জিজ্ঞাসা না করেই ড্রয়িংরুমে ফিরে এলেন।

অরুণা তখন কৃষ্ণাকে বলছিল, 'ঝরনা দেখতে আমায় একদিন যেতেই হবে। এখানে এসে আমি চুপচাপ বসে থাকতে রাজী নই।'

কৃষ্ণা বললে, 'কাকাবাবুকে জিজ্ঞেস করে দেখব। তিনি যে বাড়ির

কর্তা একথা কেউ স্মরণ না রাখলেই তিনি চটে যান। কিন্তু একবার অনুমতি নিয়ে যা খুশি কর, তিনি কোনো আপত্তি করবেন না।'

প্রীতিলতা একটু ব্যস্তভাবে ঘবে ঢুকলেন। হাঁপাতে হাঁপাতে সোফার ওপর বসে পড়ে বললেন, 'তোব অনিল মামা আসছে কৃষ্ণা কাল সকালে। মনে পড়ে তাকে।'

—'খুব, কাল সকালেই আসছেন?'

—'টেলিগ্রাম করেছে গ্র্যাণ্ড হোটেল থেকে। বিলেত থেকে এসে গ্র্যাণ্ডেই উঠেছে কিনা।'

কৃষ্ণা খুশিতে একেবারে ফেটে পড়ল। অরুণাব দিকে চেয়ে বললে, 'অনিল মামা এলে আমাদেব আর কোন কিছুর জন্যে ভাবতে হবে না। ঝরনা থেকে পাহাড়, যেখানে খুশি যাওয়া চলবে।'

প্রীতিলতা বললেন, 'তা চলবে, কারণ সেও তোদেব মতই দুদণ্ড একজায়গায় থাকতে পারে না। কিন্তু তোদের ক'টা কাজ যে আজ রাত্রেই সেবে বাখতে হবে মা। দুজনে মিলে ডানদিকেব ঘরখানা একটু গোছগাছ কবে বাখ। ভারী খুঁতখুঁতে ছেলে, এতটুকু অপরিষ্কাব সহ্য করতে পাবে না। চাকর-বাকরদের উপব ভাব দিলে চলবে না; কোনটা ভাঙবে, কোনটা ছিঁড়বে—'

মোট কথা প্রীতিলতার হাঁকডাকে বাড়িখানা কয়েক মিনিটের মধ্যেই সরগবম হয়ে উঠল। তাঁর নিজেব ভাই বলতে কেউ কোনদিন নেই, ভাই বলতে এই অনিল। তাব ওপব সদ্য বিলেত-ফেবত। তার ওপর অনেক টাকার মালিক। প্রীতিলতাব পক্ষে তার কাছে কোনদিক্ থেকেই ছোট হওয়া চলে না।

এ বাড়িব আহার-পর্বটা বিলিতী প্রথায় সম্পন্ন হয়। মিস্টার ঘোষ থেকে আরম্ভ কবে কৃষ্ণা পর্যন্ত সবাইকেই ডিনাব-টেবিলে দেখা যায়। সেদিন বাত্রে ডিনাবেব সমস্ত সময়টা প্রীতিলতা তাব সদ্য বিলেত-প্রত্যাগত ভাইটিব কথায় মুখব হযে রইলেন। সংসাবে অনিলের

আপনার লোক বলতে এখন নাকি কেবল তিনিই। অনিলের বাপ মরবার সময় একমাত্র ছেলের জন্যে লাখ-ছুয়েক টাকা রেখে গিয়েছিলেন, তাছাড়া কলকাতার চৌরঙ্গী অঞ্চলের বাড়িটিও প্রকাণ্ড। ভারী ভাল ছেলে এই অনিল, সামাজিক শিষ্টাচারের আদর্শ। অনিল ভয়ানক ফুল ভালবাসে, আর খুব সুন্দর গল্প বলতে পারে। মিঃ ঘোষের ঘরের ফ্লাওয়ার-ভাস ছুটি এবং ইজিচেয়ারখানা অনিলের ঘরেই রাখতে হবে।

শেষ কথাটা শুনে মিঃ ঘোষ একটু চিন্তিত হলেন। ইজিচেয়ারখানা তাঁব অত্যন্ত প্রিয়। তিনি বললেন, 'চেয়াবখানা কি অনিলের না হলেই চলবে না?'

—'ছু-দিনের জন্যে আসছে বইতো নয়। তার জন্যে তোমায় একটু আধটু কষ্ট স্বীকাব করতেই হবে। এগুলো সহজ ভদ্রতা··· সামাজিকতা—'

—'এবং পাবিবারিক দাবি। কিন্তু পরিবাবেব ওপর আমারও বোধ হয় কিছু দাবি থাকা উচিত।'

মিঃ ঘোষেব কথাব সুরে অকণা এবং কৃষ্ণা ছুজনেই হেসে ফেললে।

প্রীতিলতা বললেন, 'মাই গড্! তুমি আমার ব্লাড-প্রেসার না বাড়িয়ে ছাড়বে না।'

ঘোষ সাহেব হতাশাব ভঙ্গী কবে উঠে পড়লেন।

পরদিন বেলা প্রায় দশটাব সময় অনিল এসে পৌছল। দীর্ঘ চেহাবা; চোখে-মুখে প্রতিভাব দীপ্তি। মাথাব চুলগুলো ব্যাকব্রাশ কবা। শার্ট ও শর্ট পরা অনিল বোস একহাতে দামী সিগাবেটের টিন, আব এক হাতে ভায়োলিনের কেস নিযে যখন মিঃ ঘোষের 'কটেজের' সামনে এসে দাঁড়াল, প্রীতিলতা প্রভৃতি সকলেই তখন বারান্দায় তারই

অপেক্ষা প্রতীক্ষা করছিলেন। প্রীতিলতা শশব্যস্ত হয়ে নীচে পর্যন্ত নেমে গেলেন, সঙ্গে সঙ্গে কৃষ্ণা। মিঃ ঘোষও এক ধাপ নামলেন, অরুণা বারান্দাতেই দাঁড়িয়ে রইল।

উপরে উঠতে উঠতে অনিল বললে, 'তুমি কি ভীষণ মোটা হয়ে গেছ দিদি। দিনের বেলা না হলে চেনাই কষ্টকর হত।'

মিঃ ঘোষের হাতে প্রচণ্ড একটা ঝাঁকুনি দিয়ে অনিল বললে, 'হ্যালো, মিস্টার ঘোষ! আপনিও তো দেখছি রীতিমত কর্তা ব্যক্তি হয়ে পড়েছেন। মাথার টাক এবং ব্যাঙ্কের টাকা দুইই বেড়েছে বলে মনে হচ্ছে।'

মিঃ ঘোষ একটু হাসলেন মাত্র।

—'তারপর কৃষ্ণা তুই কিরকম আছিস রে? রীতিমত বড হয়ে উঠেছিস দেখছি।'

অনিল এবাব অরুণার দিকে চাইল। তার প্রখর ব্যক্তিত্বেব কাছে অরুণা যেন ম্লান হযে গিয়েছিল। অনিলও এবার যেন হঠাৎ থতমত খেয়ে গেল। পবমুহূর্তেই নিজেকে সামলে নিযে বললে, 'এঁকে তো চিনতে পারলাম না? আগে দেখেছি বলে মনে হয না।'

প্রীতিলতা বললেন, 'তুই কোথা থেকে দেখবি? ও হল কৃষ্ণাব কলেজেব বন্ধু, একসঙ্গে দুজনে ফিফ্‌থ ইযাবে পড়ে।'

অনিল বললে, 'ও!'

হাত তুলে নমস্কাব করলে অরুণাকে। অরুণাও বিব্রতভাবে প্রতি-নমস্কার জানালে কিন্তু হাত তুলতে গিয়ে বুকের ভেতরটা যেন অকারণে কেঁপে উঠলো।

প্রীতিলতা বললেন অনিলকে, 'তারপর ফিরলি কবে? এতদিনে বোনকে খবব দেবার ফুরসত হল বুঝি?'

—'যার কোন কাজ নেই, সেইতো সবচেয়ে কাজের মানুষ, জানো তো?' অনিল হাসতে হাসতে বললে, 'এসেছিলাম কতকগুলো

জরুরী কাজ মিটিয়ে দিন কয়েকের মধ্যে ফিরে যাব বলে। কিন্তু ঝঞ্ঝাট মিটতে এখনও বেশ কিছুদিন দেরি হবে। তাই ভাবলাম, দিন কয়েক তোমাদের সিমলা পাহাড়ে হানা দিয়ে আসি।'

কী অদ্ভুত ছেলে এই অনিল। দেখলেই মনে হয়, দুরন্ত একটা প্রাণশক্তি যেন তার মধ্যে দিনরাত টগবগ করে ফুটছে। কথার বিরাম নেই, দুদণ্ড স্থির হয়ে বসতেও পারে না।

প্রথম দিনেই খাওয়া-দাওয়াব পব বললে, 'এব আগে যেবার এসেছিলাম, সেবার কিছুই দেখা হয়নি। এবার কিন্তু তোমাদের এখানকাব ঝরনা-টরনাগুলো না দেখে যাচ্ছি না। তুমি ব্যবস্থা কর দিদি।'

কৃষ্ণা পর্যন্ত লাফিযে উঠলো।

—'আমরাও যাব অনিল মামা।'

—'আমরা মানে?'

—'আমি আর অরুণা। অরুণা কদিন থেকেই আমায়—'

—'বাঃ বে! আমি আবাব কখন . '

অরুণা বাধা দেবার চেষ্টা করতেই অনিল বললে, 'আপনি বিব্রত হবেন না। কৃষ্ণাকে ছেলেবেলা থেকে জানি, মানুষকে বিপদে পড়তে দেখলে ওব ভারি আনন্দ হয়। তবে একজন প্রায়-অচেনা লোকের সঙ্গে দূর পাহাড়ে যেতে সংকোচ হতে পারে। কাজেই আমি জোর করবো না। যাই হোক দিদি, তুমি আয়োজন করতে ভুলো না; আমার যাওয়াটা পাকা।'

খুব স্পষ্ট কোন কারণ ছিল না, কিন্তু নিজের ঘরে ফিরে এসে অরুণার এই সদ্য চেনা লোকটির ওপর রাগ হতে লাগল। 'আমি জোর করবো না।' কেমন তাচ্ছিল্যে ভরা কথা! যেন জোর করলেই অরুণা যেতে রাজী হত! আর কি বকবকই করতে পারে লোকটা। বিলেতের গল্প, ছেলেবেলার গল্প, যত রাজ্যের গল্প! গল্প বলতে বলতে

চা-কফি ঠাণ্ডা হয়ে যায়; মাঝে মাঝে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে গিয়ে কি যেন ভাবে।

প্রীতিলতা অনুযোগ করলে বলে, 'তুমি ভেব না দিদি। ঠাণ্ডা চা খাওয়াটা আজকাল সভ্যতার অঙ্গ হয়ে উঠেছে। তা ছাড়া, ওদেশে কেউ তো আমার জন্যে রোজ ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে বসে থাকে না।'

সব বিষয়ে এই রকম একটা নিস্পৃহ, উদাসীন ভাব। অরুণার ভাল লাগে না। লোকটি কথা বলে অনেক, কিন্তু তার মধ্যেও একটা দূরত্বের ভাব। নিশ্চয়ই বিলেত ঘুরে আসার 'পোজ'। কৃষ্ণাও এখনও মামাকে পুরোপুরি বুঝে উঠতে পারেনি। তাই সে কথায় কথায় অনিলের নামে উচ্ছ্বসিত হয়ে ওঠে। অরুণা কিন্তু তার দলে পড়তে রাজী নয়।

দিন দুই পরেই কিন্তু ঝরনা দেখতে যাওয়ার ব্যবস্থা করে ফেলল অনিল আর কৃষ্ণা। অরুণা নিজের ঘরে বসে সেলাই করছিল, কৃষ্ণা এসে বললে, 'চল্, কাকাবাবুর হুকুম নেওয়া হয়ে গেছে, আর অনিল-মামাও তৈরী।'

অরুণা 'যাবে না' বলতে গিয়ে থেমে গেল। হঠাৎ মন হল, যাওয়াটা নিতান্ত মন্দ হবে না, লোকটাকে বোঝবার একটু সুযোগ পাওয়া যাবে এবং দরকার হলে তার 'পোজ'টাকে কৃষ্ণার সামনে ভেঙে দেওয়া চলবে। কথাটা মনে হতেই অরুণা নিজের মনের মধ্যে আশ্চর্য একটা উত্তেজনা বোধ করতে লাগল। চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল যাবার জন্যে।

পাহাড়ী রাস্তা—কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু। আকাশ মেঘে ঢাকা, কিন্তু সে মেঘ যেন জমাট নয়, কুয়াশার মতন হালকা। মধ্যে মধ্যে সেই কুয়াশা গলে একপসলা বৃষ্টি হয়ে যাচ্ছে। অসমতল এই

সুর ও বীণা

পথ ধরে অনিল, কৃষ্ণা, অরুণা ও একজন স্থানীয় কুলী এগিয়ে চলেছে। কুলীর মাথায় হালকা বেডিং কম্বল সমেত, বেতের একটা বাস্কেট খাবার জিনিসে বোঝাই। অনিলের কাঁধে ঝুলছে ফ্লাস্ক আর ক্যামেরা, হাতে ভায়োলিনের কেস। কুলীটাই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছিল।

কিছুদূর যাবার পর সংকীর্ণ পথেব পাশে একটা খাদ দেখা গেল। গভীব খাদ, নীচেব দিকে চাইলে ভয় হয়। পথ সেখানটায় রীতিমত অসমতল। সেই পথ জুড়ে প্রকাণ্ড একটা পাথর; পাথবটা শেওলা এবং জলে রীতিমত পিছল। কুলীটা কিন্তু অবলীলাক্রমে সেটা ডিঙিয়ে পার হয়ে গেল। তারপরে গেল অনিল।

কৃষ্ণাব পালা আসতেই সে বললে, 'আমাব ভয় করছে মামা। তুমি হাতটা বাড়িয়ে দাও—'

অনিল হাত বাড়িয়ে দিল। কৃষ্ণা অতি কষ্টে পাথরটা ডিঙিয়ে ওধাবে পৌঁছলো। তাবপব অনিল অরুণাকে সাহায্য করবার জন্যে হাতটা বাড়িযে দিল।

অরুণা বললে, 'আপনাকে কষ্ট কবতে হবে না অনিলবাবু, আমি নিজেই যেতে পাবব—'

অনিল হাসতে হাসতে বললে, 'বেশ ত! কিন্তু দেখবেন একটু সাবধানে—পা ফসকে গেলে একেবারে হাজার খানেক ফুট নীচে গিয়ে পড়তে হবে।'

অরুণা সে-কথায় কান না দিয়ে পাথরটা ডিঙোতে গেল। কিন্তু পা ঠিক ফেলতে পাবল না। আর একটু হলেই নীচে পড়েছিল আর কি। কৃষ্ণা শিউবে উঠল, কিন্তু মাবাত্মক কিছু ঘটবাব আগেই অনিল হাত বাড়িযে অরুণাকে ধবে ফেললে। ক্ষোভে, লজ্জায় অরুণা আর অনিলের দিকে চাইতেই পাবল না।

অনিল বললে, 'আর একটু হলেই বিপদ ঘটিয়েছিলেন আর কি!

একে ত কৃষ্ণা অনেক সাধ্য-সাধনা করে আপনাকে এতদূরে টেনে এনেছে, এর ওপর হঠাৎ যদি—'

—'আমি ঠিক পারতাম অনিলবাবু, আপনি সামনে থেকে একটু সরে দাঁড়ালেন না কেন ?'

—'অন্যায় হয়েছে। আমি কাছে দাঁড়িয়ে থাকলে আপনার অসুবিধে হতে পাবে এ-কথা আগে মনে হয়নি। কিন্তু দেরি করে লাভ নেই—এগিয়ে চলুন।'

কৃষ্ণা হাসতে হাসতে এবং অরুণা গম্ভীরভাবে অনিলের পিছনে পিছনে যেতে লাগলো। কিন্তু সমস্ত রাস্তা ধরে অরুণা যেন নিজেকে কিছুতেই ক্ষমা করতে পারল না। সে এসেছিল হাসি কৌতুক আর ব্যঙ্গের খর-শরাঘাতে এই লোকটার পালিশ করা সমস্ত আবরণ ছিন্ন-ভিন্ন করে ফেলতে, কিন্তু গোড়াতেই তাকে যে এমনি করে হাস্যাস্পদ হতে হবে একথা সে ভাবেনি।

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সবাই নিবাপদে ঝবনার কাছে পৌঁছল। তারপর এ-দিকে ও-দিকে খানিকটা ঘোবাঘুবি করে অবশেষে তারই কাছাকাছি একটা জাযগায বীতিমত একটা আসব জমে উঠল। মাটির উপব কম্বল বিছানো, তাব ওপর ছোট ছোট গোটা দুই হাওয়া-বালিশ। বেতেব বাস্কেটটা খুলে খাবাব জিনিসপত্তর প্লেটে সাজানো হয়েছে ; কৃষ্ণা ফ্লাস্ক থেকে চা ঢালছে ব্যাকেলাইটের পেয়ালায়। কাছে এবং দূরে মেঘে ঢাকা পাহাড়ের আভাস।

অনিল অন্যমনস্কের মত বসে ছিল। কৃষ্ণা বললে, 'হঠাৎ সবাই চুপ করে গেলেন কেন ? ভাল লাগছে না বুঝি আপনাদের কারুর ?'

অনিল বললে, 'অদ্ভুত লাগছে। মনে হচ্ছে এটা সুইজারল্যাণ্ডের কোন—'

কৃষ্ণা সবেগে ঘাড নেড়ে বললে, 'আজ কিন্তু গল্প নয় মামা, আজ আপনার ভায়োলিন শুনব।'

অনিল বললে, 'আমিও সেই কথাই ভাবছিলাম। কিন্তু তোমার বন্ধুটি পাছে বিরক্ত হন, সেই ভয়ে—'

অরুণা অনেকক্ষণ থেকে অনিলকে আঘাত করবার একটা সুযোগ খুঁজছিল। সে বললে, 'ভাল বাজনা শুনে বিরক্ত হবে, কৃষ্ণার বন্ধুকে এতখানি অপদার্থ না হয় নাই বা মনে করলেন। তবে যদি মনে করেন, শোনবার উপযুক্ত লোক নই—তবে সে-কথা আলাদা।'

অনিল কিন্তু কথাটা গায়ে মাখল না। বললে, 'আমি মোটেই সেদিক থেকে কথাটা বলিনি। কিন্তু কি বাজাব বলুন ত? ব্লু ড্যানিউব?'

উত্তরের জন্যে অপেক্ষা না করে অনিল বাক্স থেকে ভায়োলিন বার করলে। তারপর অল্পক্ষণের মধ্যেই যেন সুরের সুরধুনী নেমে এল সেই পার্বত্য নিজনতায়। অনিলের আয়ত দুই চোখের স্বচ্ছ দৃষ্টি যেন উদাস হয়ে কোন্ এক রহস্যলোকে চলে গেল এবং অরুণা বিস্ময়-বিস্ফারিত চোখে চেয়ে রইল অনিলের কুশলী হাতের দ্রুত সঞ্চবমাণ আঙুলগুলিব দিকে। ভাযোলিনেব আলাপ শুনতে শুনতে কেবল অরুণার নয়, কৃষ্ণারও মনে হতে লাগল ড্যানিউব নদীর দুই তীরে সন্ধ্যা-স্তিমিত অন্ধকারে সারি সারি আলো জ্বলে উঠেছে। আর সেই আলো-অন্ধকাবের মধ্যে কারা যেন নৌকো ভাসিয়ে করুণ একটা গান গাইতে গাইতে কোন্ একটা দূর দেশে চলে যাচ্ছে।

বাজনা থামবাব পরেও অনিল যেন আত্মবিস্মৃতের মত বসে রইল। সময়ের চাকা যেন থেমে গেছে। অরুণারও মনের উগ্র উত্তেজনাগুলো যেন সুরের স্নেহস্পর্শে একেবারে ঘুমিযে পড়েছে।

মৌনভঙ্গ করে কৃষ্ণা বললে, 'কি ভাবছেন অনিল মামা?'

অনিল যেন চমকে উঠল, কিন্তু তক্ষুনি নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'কিছু না, একটা বাজে কথা মনে পড়ছিল। কিন্তু আমি যে

পরিশ্রম করে এত বড় একটা সুর বাজালুম, তোমরা ত কেউ একটু প্রশংসাও করলে না।'

কৃষ্ণা বললে, 'প্রশংসায় ওর দাম কমে যাবে, তাই চুপ করে ছিলাম। তোর কেমন লাগল অরুণা?'

—'অদ্ভুত।'

—'সত্যি বলছেন, না নিছক মন-রাখা-কথা?'

—'আপনি এত ভাল বাজাতে পারেন, একথা ভাবতে পারিনি। কোথায় শিখেছিলেন?'

—'বুদাপেস্তে এক হাংগেরীয়ানের কাছে।'

—'ইওরোপে কেবল এই করেই কাটিয়েছেন বুঝি?'

—'এক রকম তাই। পাঁচ বছর শুধু এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায়। অল্প বয়সে অজস্র পয়সা এসে পড়েছিল হাতে; সেগুলোর সদগতি হওয়া দরকার ছিল। নইলে distribution of wealth কথাটার মানে বোঝা হত না।'

—'কিন্তু বছরের পর বছর এমনি ঘুরে বেড়াতে কি সত্যি আপনার ভাল লাগে?'

—'শুনলে আপনারা হয়ত হাসবেন। কিন্তু আমার কি মনে হয় জানেন? আমি যেন এদেশের কেউ নই। এর সঙ্গে আমার নাড়ীর কোন যোগ আমি খুঁজে পাই না। দেশের ছেলে হিসেবে এটা নিশ্চয়ই আমার অপরাধ, কিন্তু কথাটা সত্যি। আমার দিনগুলো সেখানে কি করে কাটতো জানেন? হোটেল থেকে ট্রেন, ট্রেন ছেড়ে কোন luxury liner, তার দুদিন পরে হয়তো এরোপ্লেনে; প্লেন থেকে নেমে হয়তো এয়ারপোর্টেই কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম, তারপর গন্তব্যস্থল ঠিক না করেই একটি ট্যাক্সিক্যাবে উঠে বসা। মোটর ছেড়ে আবার ট্রেন, ষ্টীমার কিংবা প্লেন ধরা। এর মধ্যে চমৎকার একটা ছন্দ আর স্পীড রয়েছে। আপনাদের এসব ভাল লাগে না?'

অরুণা অনিলের কথার জবাব দেবার আগেই কৃষ্ণা উঠে পড়ছিল—দুজনকে আলাপের পূর্ণ সুযোগ দেবার জন্যে। অবণা সেটা বুঝতে পেরে কৃষ্ণার হাত ধরে টানল আর সেই সময় ঝরঝর করে নামল বৃষ্টি—আবছা অন্ধকারে চারদিক ছেয়ে গেল।

মিঃ ঘোষের 'কটেজে' ফিরে অরুণা যখন ক্লান্ত দেহটাকে বিছানার ওপর ছড়িয়ে দিল, তখনও তার দুই কানে যেন অনিলের সেই প্রশ্নটাই বাজছে—'এসব আপনাদের ভাল লাগে না?' প্রশ্নটা যে অনিল বিশেষভাবে তাকেই করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অরুণা কোন উত্তর দিতে পারেনি। তার সমস্ত মনটা যেন ঝড়ের রাত্রে প্রদীপ-শিখার মতন থরথর করে কেঁপে উঠেছিল। কি উত্তরই বা সে দিতে পারতো? ভালো লাগে? সে-কথা স্বীকার করার মানেই তো এই স্বল্পপরিচিত অদ্ভুত লোকটির খেয়াল-খুশিগুলো মেনে নেওয়া। লোকটিকে খেলো করতে গিয়ে সেকি নিজেই খেলো হয়ে ফিরে আসবে?

ডিনার-টেবিলে অরুণা ভাল করে অনিলের মুখের দিকে চাইতে পারল না। কিন্তু মনে মনে প্রতি মুহূর্তে আশা করতে লাগল যে আহার-পর্বটা মিটে গেলেই কৃষ্ণা আর একবার তার মামাকে ভায়োলিন বাজাবার জন্যে অনুরোধ করবে। কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। অনিলও যেন অন্য দিনের তুলনায় একটু কম কথা বললে এবং এইভাবেই খাওয়া-দাওয়া মিটল।

তারপর বাড়ির বিজলী-বাতিগুলো একে একে নিভলো। খোলা জানালা দিয়ে মেঘলা জ্যোৎস্না কৃষ্ণা আর অরুণার খাটের ওপর এসে পড়েছে। রোজকার মতন আজও দুজনে একই বিছানায় শুয়েছে। কৃষ্ণা ঘুমিয়ে পড়েছে অনেক আগেই। ওদিকের ঘর থেকে প্রীতিলতার নাক ডাকার শব্দ শোনা যাচ্ছে। মিঃ ঘোষ পাইপ মুখে দিয়ে ভিতরের

বারান্দায় পায়চারি করছেন। তাঁর স্লীপারের মৃদু শব্দ মাঝে মাঝে শোনা যাচ্ছে। একটু পরেই এ শব্দ থেমে যাবে। কিন্তু অরুণার ঘুম আসছে না। সমস্ত শরীর ক্লান্তিতে ভেঙে পড়ছে, তবু ঘুম আসছে না। ঘুমের বদলে যত এলোমেলো চিন্তা। কি ভাবছে তার ঠিক নেই, কিন্তু ভাবতে বেশ লাগছে। এক একবার মনে হচ্ছে—কৃষ্ণার নাকের ডগায় সুড়সুড়ি দিয়ে তার ঘুমটা ভাঙিয়ে দেয়। এত ঘুমুতেও পারে।

বারান্দায় মিঃ ঘোষেব স্লাপারের শব্দ আর শোনা যাচ্ছে না। তিনি শুয়ে পড়েছেন নিশ্চয়। সমস্ত বাড়িখানা চুপচাপ, যেন কোন্ মাহেন্দ্র-ক্ষণের অপেক্ষা। অরুণা একবার বাড়ির কথা ভাববার চেষ্টা করল। কদিন চিঠি দেওয়া হয়নি। অনিল যেদিন আসে সেইদিন চিঠি লেখার তারিখ ছিল। কিন্তু এই কদিনের হট্টগোলে সে কথা তার আর মনেই পড়েনি। বাবা নিশ্চয় রাগ করেছেন, বরুণা ভাবচে।

কিন্তু এসব ভাবতে বেশীক্ষণ ভাল লাগল না অরুণার। হঠাৎ মনে হল অনিল বলছে: 'আমার জন্যে কেউ ব্রেকফাস্ট সাজিয়ে বসে থাকে না।' সে যাই হোক, বেহালা বাজাবার পর একটু প্রশংসা পাবার জন্য অত বেশী লালায়িত হওয়া ভাল হয়নি। এটাও কি একটা পোজ নাকি?

আরও কিছুক্ষণ পরে অরুণা হঠাৎ বিছানার ওপর উঠে বসল। ভায়োলিনের ক্ষীণ সুর ভেসে আসছে। প্রথমটা ভাবল, মনের ভুল। কিন্তু···না, কিছুক্ষণ কান পেতে বসে থাকবার পরেই সন্দেহ মিটে গেল। একটি মাত্র মানুষের আঙুলই শুধু সুরের এমন মিষ্টি ঝংকার তুলতে পারে।

অনিল তার ঘরে 'মুনলাইট সোনাটা' বাজাচ্ছিল।

অরুণা কয়েক মিনিট চুপ করে বসে থেকে যেন সেই সুরের ঝরনাধারায় অবগাহন করল। তারপর কি হল কে জানে, ঘরের

দরজা খুলে সন্তর্পণে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। অনিলের ঘরটা এ লাইনের একেবারে শেষ দিকে; প্রীতিলতার ঘরের ঠিক পাশে। অরুণাকে কে যেন সেই ঘরের দিকে টেনে নিয়ে যেতে লাগল। মৃদু জ্যোৎস্নায় পামটবগুলোর ছায়া পড়েছে বারান্দায়; মিঃ ঘোষের প্রকাণ্ড অ্যালসেশিয়ান কুকুরটা ঘেউ ঘেউ করে বাড়িসুদ্ধ সবাইকে জাগিয়ে তুলবে। কিন্তু অরুণার সে কথা একবার মনেও হল না। নিশি-পাওয়া মানুষেব মতন সে একেবাবে অনিলের ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। ঘরের দরজা বন্ধ। অরুণা দরজার গায়ে মাথা হেলিয়ে কতক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে রইল—মন্দিবের দরজায় যেমন করে দাঁড়িয়ে থাকে পূজার্থিনীরা, অনেকটা সেই রকম। হুঁশ হল যখন ঘরের ভেতর বাজনা থেমে গেছে। অ্যালসেশিয়ানটাও যেন একটু নড়ে চড়ে উঠলো।

অরুণার যেন তন্দ্রা ভাঙলো।

ছি! ছি! সে করেছে কি! জয়-তিলক পরতে গিয়ে একেবারে পরাজয়ের কালি মুখে মাখতে চলেছে? তাড়াতাড়ি বারান্দা পার হয়ে সে নিজের ঘরে ঢুকে অস্বাভাবিক ব্যস্ততার সঙ্গে দরজায় খিল এঁটে দিল।

পরদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে অরুণাকে অনেকক্ষণ বিছানায় চুপ কবে বসে থাকতে দেখা গেল। মুখ হাত ধুয়ে, খাটের তলা থেকে হঠাৎ সে স্যুটকেসটা বিছানার ওপর তুলল, আলনা থেকে নিজের জামা-কাপড়গুলি নামিয়ে অত্যন্ত মন দিযে স্যুটকেসটা ভরতি করতে লাগল। কৃষ্ণা ঘুম থেকে উঠে বেড়াতে বেরিয়েছিল, ফিরল যখন তখনও অরুণার স্যুটকেস গোছানো শেষ হয়নি। অরুণাকে সেই অবস্থায় দেখে একটু আশ্চর্য হল কৃষ্ণা; বললে, 'হঠাৎ জিনিসপত্র গোছাবার ধুম পড়ে গেল যে?'

অরুণা বললে, 'কলকাতায় যাচ্ছি।'

—'আজই নাকি ?'

—'হ্যাঁ, আজই।'

—'কাকাবাবু আর কাকীমাকে বলেছিস ?'

—'যাবার আগে বলে যেতে হবে বইকি।'

অরুণার এই অভাবিত সিদ্ধান্তে বাড়িসুদ্ধ সবাই অবাক্। ঝরনা দেখার পর একদিন কাছাকাছি একটা জায়গায় পাখি শিকারে যাওয়ার কথা ছিল। কথাটা তুলেছিল অনিল, এবং ঘোষসায়েব পর্যন্ত যেতে রাজী হয়েছিলেন। অরুণাও যথেষ্ট আগ্রহ দেখিয়েছিল। তার পর এই ব্যাপার।

প্রীতিলতা ভাবলেন তাঁর সামাজিক শিষ্টাচারে কোথাও ত্রুটি ঘটেছে। মিঃ ঘোষ ভাবলেন, এখানকার আবহাওয়া অরুণার আর ভাল লাগছে না। অনিলও কিছু বুঝতে পারল না। সবাই তাকে আর কয়েকটা দিন কাটিয়ে একবারে কৃষ্ণার সঙ্গে কলকাতায় ফেরবার জন্যে অনুরোধ করল। কিন্তু অরুণাকে রাজী করানো গেল না, সেই দিনই সে সিমলা ছাড়ল।

সিমলা থেকে অরুণা বেগমপুরে ফিরল না। কলকাতায় পিসিমার বাড়িতেই উঠল।

পিসিমা বললেন, 'এরি মধ্যে চলে এলি ?'

—'ভাল লাগল না।'

—'তা হলে দিনকতক বাড়ি থেকে ঘুরে আয়। দাদা খুশী হবেন।'

—'বাড়ি এখন যাওয়া চলবে না পিসিমা।'

অরুণা পড়াশুনায় মন দেবার চেষ্টা করল, মন বসল না। দিন দুই সিনেমা দেখতে গিয়ে ইন্টারভ্যালে উঠে চলে এল। দেশী এবং বিদেশী ছবিগুলোয় প্রেমে-পড়াটাকে এত সহজ করে দেখানো হয় যে হাসি আর রাগ দুইই সামলানো শক্ত। কিন্তু এমনি করেই বা কদিন

কাটানো যায়? এক সপ্তাহের মধ্যেই অরুণা যেন নিজেকে নিয়ে বিষম বিব্রত হয়ে পড়ল। আরও দু-একটা দিন কোন রকমে কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত বাড়ি যাওয়াই স্থির করলে। কিন্তু যাবার আগেই সব গোলমাল হয়ে গেল।

সকাল বেলা অরুণা তার পড়ার বইগুলো গুছিয়ে রাখছিল। এমন সময় কৃষ্ণা এসে হাজির।

অরুণা একটু লজ্জিত ভাবেই জিজ্ঞাসা করলে, 'কবে এলি?'

—'কাল।'

—'আমার ওপর তোরা খুব রাগ করেছিস, কি বল্?'

—'যদি জানতিসই, তা হলে এমন কাণ্ডটা করলি কেন?'

—'অন্য কোন উপায় ছিল না।'

—'জানি। কিন্তু অনিলমামা বাঘ না ভাল্লুক? তোকে খেয়ে ফেলতো না নিশ্চয়ই?'

—'ভয় আমার নিজেকে, অনিলবাবুকে নয়।'

—'বুঝতে পারছি। কিন্তু তিনি কতটা লজ্জিত হলেন বল্তো? তুই চলে আসার দিন দুই পরে তিনিও চলে এলেন কলকাতায়।'

—'শিকার করতে যাসনি তোরা?'

— 'না।'

—'আমি খুব দুঃখিত ভাই কৃষ্ণা। কিন্তু মন আমি ঠিক করে ফেলেছি আমি আজই দিন কয়েকের জন্যে দেশে যাব।'

—'পলায়ন! একেবারে রাজ্য ছেড়ে পলায়ন?'

—'তুই বড় দুষ্টু হয়ে উঠছিস কৃষ্ণা।'

—'তুই-ই বা কি কম!'

দুই বন্ধুর কথাবার্তা চলছে, চাকর এসে অরুণার হাতে একখানা খাম দিল। অপরিচিত হাতের লেখা। অরুণা বিস্ময় আর কৌতূহল নিয়ে তাড়াতাড়ি খামটা খুলে ফেলল।

অনিলের চিঠি। রুদ্ধ নিশ্বাসে চিঠিখানা আগাগোড়া পড়ে ফেলে অরুণা চুপ করে দাঁড়িয়ে রইল। কথা নেই মুখে।

কৃষ্ণা বললে, 'ব্যাপাব কি বে? একেবারে বাজ-পড়া তাল গাছের মতন আড়ষ্ট হয়ে গেলি যে?'

অরুণা একটি কথাও বলল না। শুধু অনিলের চিঠিখানা কৃষ্ণার হাতে তুলে দিল।

অনিল লিখেচে ঃ

সুচরিতাষু,

প্রথমেই আপনাব কাছে ক্ষমা চাইছি, হঠাৎ এই চিঠি লেখার অসৌজন্যের জন্য। কিন্তু কী জানি কেন, চিঠিখানা না লিখেও পাবলাম না। আপনি যেদিন হঠাৎ চলে এলেন সেই দিনই সিমলা পাহাড আমাব কাছে ফাঁকা হযে গেল। আমিও দিন দুই পবেই পালিয়ে এসেছি। কেবলই মনে হযেছে, আপনার এই হঠাৎ চলে আসার ব্যাপাবে কোথায যেন আমার একটা যোগ রয়ে গেছে। হয়ত আমাব ধাবণা ভুল। কাল লেক ক্লাবেব বাৎসবিক 'রিগাটা'। যদি আসেন তাহলে এইটুকু জানবার অবকাশ পাব যে আমাব কোন অন্যাযের জন্যে আপনাকে সিমলা ছেড়ে চলে আসতে হয়নি। আমার ঘরের নম্বব ৭৪। সন্ধ্যা সাড়ে সাতটা পর্যন্ত অপেক্ষা কবব। আসবেন তো? ইতি—

আপনার জীবনেব অবাঞ্ছিত উপদ্রব—

অনিল বসু।

কৃষ্ণা চিঠিখানা ভাল করে পড়ে বললে, 'ব্যাপাব যে কতকটা এই বকম দাঁড়াবে তা আগেই আন্দাজ কবেছিলাম। লেট আস হোপ ফব দি বেস্ট। কি করবি?'

—'কি আবাব করব?'

—'যাবি না ?'

—'না। সন্ধ্যার ট্রেনেই আমি বাড়ি যাব।'

গ্র্যাণ্ড হোটেলের ৪৪নং কামরা। ঘড়িতে সাতটা চল্লিশ।

অনিল ক্লাবের রিগাটায় যাবার জন্য তৈরী হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। চোখের দৃষ্টি থেকে থেকে ঘড়ির ওপর পড়ছে। কয়েক মিনিট নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে থেকে প্রতীক্ষা করবার পর সে ভায়োলিনের কেসটা টেবিলের উপব থেকে তুলে নিয়ে দরজার দিকে এগিয়ে গেল। কিন্তু চৌকাঠ পার হবার আগেই দেখা গেল অরুণাকে। অনিল যেন নিজের চোখকেই বিশ্বাস কবতে পারল না। আশ্চর্য হয়ে সে অরুণার মুখের দিকে চাইল। অকণাও মুখ তুলে চাইতে পারল না। শেষ পর্যন্ত অনিল বলল, 'শেষ পর্যন্ত সত্যিই আপনি এলেন ?'

—'বিশ্বাস হয়নি আপনাব ?'

—'হয়নি বললে মিথ্যে কথা বলা হবে; হয়েছিল বললে সত্যি কথা বলা হবে না। বসুন।'

—'দেরি হয়ে যাবে না ?'

—'হলেই বা দেরি। নৌকো চড়ে খানিকটা হৈহৈ করাই জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দ নয়।'

—'তবে যে লিখেছিলেন—?'

—'সত্যি কথাই লিখেছিলাম। এখনও সময় আছে। তার আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব, রাগ করবেন না ?'

—'না।'

—'সিমলে থেকে হঠাৎ চলে এলেন কেন ?'

অরুণা নিরুত্তর।

—'আমি কোন অন্যায় করেছিলাম ?'

—'না।…আমিই একটু…মানে…ভয় পেয়েছিলাম।'

—'ও। কিন্তু আজ?'

—'আধঘণ্টা আগেও জানতাম আমি এখানে আসব না। কিন্তু ঘড়ির কাঁটা সাতটার ঘরে পৌঁছবার পরেই সব যেন গোলমাল হয়ে গেল।'

অনিল খুশীতে উথলে উঠল, 'এনগেজমেণ্ট বাতিল অরুণা। রোয়িং ক্লাবে যাব না। ঘরে বসে গল্প করি এস।'

—'আমি কিন্তু বাইচ-খেলা দেখতে যাবার লোভেই এসেছিলাম।'

—'তাই নাকি? কিন্তু আমি ভাবলাম...তা ছাড়া সেখানে অনেক মানুষের ভিড, দুজনের কথা কইবার মতন নিরিবিলি জায়গাও বোধ হয় নেই।'

—'আমি তা হলে বাড়ি যাব অনিলবাবু।'

—'কখ্‌খনো না। আপনি যদি হুকুম করেন, আমি চৌরঙ্গীর চৌমাথায় দাঁড়িয়ে সন্ধেটা অনায়াসে কাটিয়ে দিতে পারি। চলুন, যাওয়া যাক।'

পূর্ণিমার রুপালী জ্যোৎস্নায় সেদিন অনেক রাত্রি পর্যন্ত নৌবিহার চলেছিল। সারি সারি দাঁড় ফেলার শব্দের মধ্যে চারিপাশের জল যেন রুপোর কুচির মতন ছলকে উঠতে লাগল, আর সেই স্বপ্নময় পরিবেশের মধ্যে অনিল ভায়োলিন বাজিয়ে চলল। অরুণা মন্ত্র-মুগ্ধের মতন চেয়ে রইল অনিলের আঙুলগুলোর দিকে। কী পরিচ্ছন্ন দীর্ঘ আঙুলগুলো...শিল্পীর সব লক্ষণ যেন সেগুলোতে জড়িয়ে আছে। অরুণা মুহূর্তের জন্যও অন্য দিকে চাইল না। সব চেয়ে আশ্চর্যের কথা এই যে অনিল এবং তার বন্ধুদের অনুরোধে সে গান গাইতেও রাজী হয়ে গেল। যেন অনেক না-বলা কথা, অ-বলা গান তার মনের মধ্যে তোলপাড় করছিল, সেগুলো প্রকাশের পথ পেতে অরুণা স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

রাত বারটার পর 'রিগাটা' শেষ হল। দুজনে এসে ট্যাক্সিতে

উঠল। গাড়ি ছোটবার সঙ্গে সঙ্গে অরুণার এলোমেলো চুল অনিলকে স্পর্শ করতে লাগল। অনিল ধীরে ধীরে হাত রাখল অরুণার হাতের ওপর ; অরুণা বাধা দিল না।

এরপর অরুণাব জীবনেব কয়েকটা দিন কাটল ঠিক যেন ঘূর্ণী হাওযার মতন। কোথা দিয়ে কি হচ্ছে সেটা ধরা গেল না, কিন্তু অনেক কিছুই যে ঘটছে তা বোঝা গেল এবং এমনি করেই অরুণা একদিন মনেপ্রাণে নিঃসংশযে উপলব্ধি করলে যে এই আবর্তের মাঝখান থেকে নিজেকে সবিযে নেবাব ক্ষমতা আব যাবই থাক, তার নেই। যাকে সে হাবাতে চেযেছিল সেই তাকে হার মানিযে ছেড়েছে।

কথাটা যথাসমযে কৃষ্ণার কানে গেল এবং কৃষ্ণাব তরফ থেকে চিঠি গেল সিমলা পাহাড়ে প্রীতিলতাব কাছে। প্রীতিলতার পীড়াপীড়িতে মিঃ ঘোষ চিঠি লিখলেন বেগমপুবের বড়তরফের জমিদাব সঞ্জীব রাযকে।

চিঠিখানা প্রথমেই পড়ল বরুণাব হাতে। পড়ে সে নিজের চোখকেই যেন বিশ্বাস করতে পাবলে না। দিদি প্রায পনের দিন আগে সিমলা থেকে চলে এসেছে, তাবপর এইসব কাণ্ড…অথচ, তারা এব কিছুই জানে না! ভযে বরুণাব মুখ শুকিযে গেল। সে শুভেন্দুর পরামর্শ নিতে ছুটল।

শুভেন্দু হাসতে হাসতে বললে, 'এতে ভয পাবাব কি আছে? আজকাল তামাম দুনিযায় ছেলেমেযেবা এই রকম করেই প্রেমে পড়ছে। শ্বশুরমশাই যদি খবর না রাখেন তা হলে সে দোষটা তাঁর। যাই হোক, আবও বেশী দেরি হবাব আগে সব কথা কর্তাকে জানিযে রাখাই ভাল। নইলে দোষ পড়বে তোমাব আব আমাব ওপর।'

বরুণা শঙ্কিত মনে চিঠি নিযে উপরে উঠল, পিছনে শুভেন্দু।

সঞ্জীব রায় তাঁর ঘরে প্রকাণ্ড খাটে রাজকীয় বিছানার ওপর তাকিয়ায় হেলান দিযে কী একটা ধর্মগ্রন্থ পড়ছিলেন। বরুণা জড়সড়

ভাবে খাটের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। সেদিকে চোখ পড়তে সঞ্জীব স্নেহ-স্নিগ্ধ কণ্ঠে বললেন, 'কি খবব মা? হাতে চিঠি কার?'

—'আপনারই।'

সঞ্জীব সোজা হয়ে বসলেন।

—'কার চিঠি?'

—'সিমলা থেকে কৃষ্ণার কাকাবাবু চিঠি লিখেছেন আপনাকে।'

—'আমাকে!—কই দেখি!' বলে চিঠিখানা তিনি বরুণাব হাত থেকে প্রায় কেড়ে নিলেন। ভাবলেন অরুণাব বোধহয় শরীর খাবাপ, কিংবা আবও কিছুদিন সেখানে থাকতে চায়। কিন্তু চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ তিনি কোন কথাই বলতে পাবলেন না। চিঠিখানায অনিলের সঙ্গে অরুণার বিয়ের প্রস্তাব ছিল। কিন্তু অক্ষবগুলো যেন অদ্ভুত মূর্তি নিয়ে তাঁব ক্ষীণ দৃষ্টিব সামনে ক্রমেই অস্পষ্ট হয়ে আসতে লাগল। শুভেন্দু ও বরুণা দুজনেই তাঁর দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

সঞ্জীব বায় আজকেব বাঙলা এবং সাবেক বাঙলার অতি দুর্বল যোগসূত্র। সেদিনেব বাঙলা দেশকে তিনি ধীবে ধীবে চোখেব সামনে মুছে যেতে দেখেছেন, কিন্তু বাঙলা যা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁর ধাবণা খুব স্পষ্ট নয়। বাযবাড়িব ঘরে ঘবে ইলেকট্রিক ডায়নামো বিজলী যোগান দেয, খাসকামবায বিবাট ডাইনিং টেবিলও শোভা পায়, কিন্তু নিজে তিনি নিষ্ঠাব সঙ্গে হিন্দুব মন্ত্র-তন্ত্র, আচাব-আচরণ মেনে চলেন। সায়েবসুবো এসে তাঁবই বাড়িতে বসে নিষিদ্ধ পক্ষীমাংস পর্যন্ত অনায়াসে অবলেহন কবে গেছে; আবাব পুজোবাড়িতে নিত্য দেবার্চনাও চলে আসছে যথোচিত সমারোহেব সঙ্গে। গোঁড়ামিকে প্রশ্রয় না দিলেও তিনি নিজে গোঁড়াই থেকে গেছেন। এক মেয়েকে যত্ন করে কেবল সংস্কৃত শেখালেও আব এক মেয়ের লবেটোয় পড়া তিনি বন্ধ করতে পারেননি। তবু এই ধবনের একটা ব্যাপাব কল্পনা

করার সাহস তাঁব কোন দিনই নেই। তাই চিঠি পড়ে কিছুক্ষণ তিনি বলবার মতন কোন কথাই খুঁজে পেলেন না।

অনেকক্ষণ পবে বরুণা সাহস করে বললে, 'চিঠিব কি উত্তর দেব বাবা?'

সঞ্জীব বায যেন স্বপ্ন দেখছিলেন, চমকে উঠে বললেন, 'লিখে দাও, এ বিয়ে হতে পাবে না। অসম্ভব! আমাব মেয়ে নিজের খেয়াল মতন বব ধবে নিয়ে আসবে আব আমি তাব হাতে কন্যা সম্প্রদান কবব, এ একেবাবে আমাব সহ্যেব বাইবে চলে যাচ্ছে!'

শুভেন্দুব দিকে চোখ পড়তেই তিনি বললেন, 'ওকে সিমলায় যেতে দেবার ইচ্ছে আমাব মোটেই ছিল না শুভেন্দু। কিন্তু তোমরা কোন আপত্তি কবলে না, তাই…এখন দেখতো বিভ্রাট!'

শুভেন্দু বললে, 'বিভ্রাট বলে নাই বা ভাবলেন। অরুণাদিব বিয়ে একদিন হবেই। এক্ষেত্রে তফাত শুধু এইটুকু যে পাত্রনির্বাচনেব সুযোগটুকু আপনি নিজে পেলেন না।'

—'এটাকে তুমি আমাব পক্ষে গৌববের বিষয বলে মনে কব নাকি?'

—'অগৌববেব বিষয বলেও মনে কবি না। বামাযণ-মহাভারতেও এমন দৃষ্টান্ত অনেক রয়েছে।'

—'দৃষ্টান্ত! নিজেদেব অপবাধগুলো ঢাকতে হলেই বামায়ণ-মহাভাবত, নইলে এসব বইয়েব নামও তোমবা কেউ মুখে উচ্চাবণ কর না। আমি কল্পনা কবতে পাবি না বাবা শুভেন্দু, আমাব মেয়ে, রায় বংশের মেয়ে—শেষটায—'

—'ভেবে দেখুন, এ বিয়ে না হলে অরুণাদি কি মনে মনে কষ্ট পাবেন না? কলেজে পড়িযে তাঁকে যখন স্বাধীনভাবে চলবার সুযোগ দিযেছেন, তখন তাঁর স্বাধীন ইচ্ছেয় বাধা না দেওয়াটাই বোধ হয় বুদ্ধিমানেব কাজ হবে। যাই হোক, এ বিষযে আমি জোর কবে তাঁর হযে ওকালতি করব না। চূড়ান্ত বিচারেব ভার আপনারই।'

সঞ্জীব কোন কথা বললেন না। শুভেন্দু আর বরুণা মিনিট খানেক চুপ করে দাঁড়িয়ে থেকে ঘর থেকে চলে গেল।

সঞ্জীব তিন দিন তিন রাত্রি ধরে ভাবলেন এবং যতই ভাবলেন, এই বিয়ের ব্যাপারে তাঁর আপত্তির তীব্রতা ততই কমে আসতে লাগল। আজকালকার ছেলেমেয়েদেব সম্বন্ধে কতটুকুই বা তিনি জানেন। হয়ত শুভেন্দু যা বলেছে তাই ঠিক এবং তিনি যা ভেবেছেন সেইটেই ভুল। হাজার হোক, অরুণা তাঁর মেয়ে; রায় বংশের নীল রক্ত তারও গায়ে বইছে। তুচ্ছ মনের আবেগের বশবর্তী হয়ে নিশ্চয়ই সে বংশমর্যাদাকে ধুলোয় লুটিয়ে দিতে রাজী হয়নি, ছেলেটি নিশ্চয়ই ভাল। অরুণা স্বাধীনভাবে চলতে শিখেছে, স্বাধীনভাবে ভাবতে শিখেছে। এখন হঠাৎ তার চলার পথ জুড়ে দাঁড়াতে গেলে, সে যদি বিপর্যয়কর কিছু একটা করে ফেলে তখন তো দশখানা গাঁয়ের লোক আরও বেশী হাসাহাসি করবে। তা হলে?

দিন চারেক পরে বরুণা আবার যখন সে চিঠিখানার কথা তুলল তখন সঞ্জীব বললেন, 'হোক বিয়ে। যা খুশি করুক সবাই। আমি কোন কথা কইব না।'

সত্যিই তিনি আপত্তি করলেন না। অরুণা বাড়ি এল। সঞ্জীব কিন্তু ভাল করে তার সঙ্গে কথা বললেন না। তবে বিয়ের উদ্যোগ-পর্ব যথাসম্ভব সমারোহের সঙ্গেই এগিয়ে যেতে লাগল। সিমলা পাহাড়ে মিঃ ঘোষের ঠিকানায় চিঠিও চলে গেল একদিন।

চিঠি পেয়ে মিঃ ঘোষ বললেন, 'অনিলকে অভিনন্দন জানিয়ে একটা তার করে দিই। অর্ধেক রাজত্ব এবং পুরো একটি রাজকন্যা—সৌভাগ্যবান ছেলে!'

প্রীতিলতা বললেন, 'তার করেই কর্তব্য শেষ করবে নাকি? আমাদের যেতে হবে না?'

—'কোথায়? কেন?'

—'কেন! বলিহারি লোক বাপু! সংসারে অনিলের আছে কে? আমরা না গেলে কে ওর কাজে মাথা দিয়ে দাঁড়াবে?'

—'দেবার মতন মাথা কেবল আমাদেরই পেলে বুঝি? কিন্তু তুমি একলা গেলেই বোধহয় ভাল হয়।'

—'এ কথা তুমি বলতে পারলে? একটু সামাজিক ভদ্রতাও কি তোমার বজায় রাখতে নেই?'

—'অনেকগুলো টাকা খরচ হবে, তাই ভাবছি। শালাজকে মূল্যবান একটা উপহারও দিতে হবে নিশ্চয়ই?'

—'হবেই তো। তোমার না হয় সমাজে মুখ না দেখালেও চলবে। কিন্তু আমি তো তা পারব না। তুমি ছুটির দরখাস্ত করে দাও। আমি কোন কথা শুনছি না।'

যেটা ঘটবার সেটা ঘটবেই—তার গতিরোধ করার ক্ষমতা সঞ্জীব রায়ের মতন পরাক্রান্ত জমিদারেরও নেই। তাই অনিলের সঙ্গে অরুণার বিয়ে একদিন সত্যি সত্যিই হয়ে গেল। শুভদিনে ফুলের মালা আর বিজলী আলোর ছটায় রায়বাড়ি হাসতে লাগল। জরিদার তকমা-আঁটা পোশাকপরা বেয়নেটধারী দরোয়ানরা ঘন ঘন গেটের সামনে ঘোরাফেরা করল। বড় বড় মোটরের হর্নে গ্রাম-পথ মুখর হয়ে উঠল। আত্মীয়-স্বজন যে-যেখানে ছিল সবাই এসে হাজির হল, এলেন না শুধু ভবশঙ্কর চৌধুরী।

নহবত বাজল, সমস্ত জমিদারির প্রজারা এসে পাত পেতে লুচিমণ্ডা খেয়ে গেল। সমারোহ এবং কলরবের কোন ত্রুটি হল না। কেবল বাড়ির মধ্যে সঞ্জীবই মুখ ভার করে রইলেন। জামাইয়ের সঙ্গে একটি কথাও তিনি বললেন না,— অনিল যেন জোর করে তাঁর মেয়েকে কেড়ে নিয়ে যাচ্ছে, এমনি একটা ভাব বার বার তাঁর মনের মধ্যে চাড়া দিয়ে উঠতে লাগল। অতি কষ্টে তিনি নিজেকে সংযত

করে রাখলেন। একা শুভেন্দুই হেসে গল্প করে, বাসরে ঢুকে গান গেয়ে ভেতরের অস্বস্তিকর অবস্থাটা একটু হালকা করে রাখল। কিন্তু সেদিকেও এক ফ্যাসাদ। এই ধরনেব হালকা হাসি-তামাসা আবার অনিলেব ভাল লাগে না। শুভেন্দুব হাসি-ঠাট্টা, কথাবার্তা সে পরিপাক করতে পারল না। এগুলোর মধ্যে সে কেমন একটা গ্রাম্য স্থূলতার গন্ধ পেয়ে শুভেন্দুর সম্বন্ধে মনে মনে একটা অপ্রীতিকর ধারণা গড়ে বসল।

বিয়ের পব দিন। বরকন্যা বিদায়ের সময়। নহবৎখানা থেকে সানাইয়ে করুণ আলাপ ভেসে আসছে। ফটকেব ভেতবে এবং বাইবে কয়েকখানা মোটব দাঁড়িয়ে। শঙ্খধ্বনির মধ্যে ববকন্যা আত্মীয়-স্বজনেব সঙ্গে মোটরেব কাছে এসে দাঁড়াল। সঞ্জীব রায় গম্ভীব মুখে মেয়ে-জামাইকে গাড়িতে তুলে দিলেন। তারপর হঠাৎ বরুণাব দিকে চেয়ে বললেন, 'হাল-ফ্যাশানেব বিয়ে বলে কি চিরকালেব নিয়মটাও তোরা ভুলে গেলি মা? আঁচল দিয়ে দিদির পা দুটো মুছিয়ে নে।'

বরুণা অশ্রুসিক্ত চোখে গাড়ির মধ্যে ঢুকে নিজেব বহুমূল্য শাড়ির আঁচল দিয়ে অরুণার আলতা-পরা পা দুটি মুছে নিল।

অনিল-অরুণার বিয়ের পব মাস ছয়েক কেটে গেছে, আর এই ছ'মাসের মধ্যে হ্যারিংটন স্ট্রীটের প্রকাণ্ড বাড়িতে অরুণার সংসার ধীবে ধীরে বাস্তব রূপ পরিগ্রহ কবেছে। অনিলদেব এই বাড়িখানা ভাড়া দেওয়া ছিল। প্রীতিলতা কলকাতায় এসে ভাড়া তুলে দিয়ে অরুণার নিজস্ব সংসারের গোড়াপত্তন করে দিয়ে গেছেন। তারপর অত বড় বাড়ির গোছগাছ করতেই কয়েকটা মাস যেন কোথা দিয়ে কেটে গেল। দেখতে দেখতে সৌখিন ও আধুনিক রুচি-সম্মত আসবাবপত্রে বাড়ির ঘরগুলি নূতন শ্রী ধারণ করল। নতুন সংসারে বিশৃঙ্খলার বদলে দেখা দিল সৌন্দর্য আর শৃঙ্খলা। নিজের সংসারে সর্বময়

কর্তৃত্বের মধ্যে কোথায় যেন অনাস্বাদিত তৃপ্তির মাধুরী মাখানো আছে ; সেই সঙ্গে অনিলের প্রখর ও উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব মিলে অরুণার সমস্ত ইন্দ্রিয় ও চেতনাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলল। বাপের বাড়ির সঙ্গে তার সম্বন্ধটা ছিল স্বভাবতঃই একটু শিথিল, সেটা এখন আরও শিথিল হয়ে এল। কিন্তু তার চেয়েও আশ্চর্যের কথা, কলেজে পড়বার সময় যে মুক্ত ও স্বচ্ছন্দ জীবনের কল্পনা তার মনকে দোলা দিত, সেটাও সে ধীরে ধীরে ভুলে যেতে লাগল। এখন নিজের এই সংসারটিকে নিয়েই সময় কাটাতে বেশ লাগে।

অনিল সমস্ত দিন বাড়ি থাকে। সন্ধ্যার পর ক্লাবে যায়। ফিরতে রাত হয় এগারটা বারটা। এই সময়টুকুব নিঃসঙ্গতা অরুণা নানারকম কাজ দিয়ে ভরিয়ে রাখে। খাবার টেবিলে দু-একটা বিস্ময়কর ভোজ্যবস্তু প্রায় প্রতিদিনই অনিলের জন্যে রাখা থাকে। বলা বাহুল্য, অরুণা নিজেই এগুলো তৈরি করে; অবশ্য বাবুর্চীর সাহায্যে। অনিল ক্লাব থেকে ফিরলে দুজনে একসঙ্গে খেতে বসে।

অরুণার পরিচর্যা আর অনিলের নির্দেশে বাড়ির ছাদের বাগানটাও এই ক'মাসে ফুলে ফুলে ভরে গিয়েছে। খাওয়ার পালা মিটলে অনিল বাগানে এসে একটা চেয়ার দখল করে বসে। তার খানিক পরে শুরু হয় সুর-সাধনা। কখনও কৃষ্ণপক্ষের অন্ধকারে, কখনও জ্যোৎস্নাস্নিগ্ধ গভীর রাত্রে অনিলের ভায়োলিন যেন দেশ-বিদেশের সুরকে সেই ছোট্ট ছাদের প্রান্তে একেবারে সজীব করে তোলে। ভক্ত শিষ্যার মত অরুণা সমস্তক্ষণ অনিলের পাশে বসে সেই বাজনা শোনে। তারপর দুজনে শুতে যায়।

কিন্তু ঘরে গিয়েই অনিল ঘুমুতে পারে না। রাত্রি দুটো তিনটে পর্যন্ত বসে বসে যত রাজ্যের বই পড়ে। কোন দিন ঘুমিয়ে পড়ে হয়ত ইজিচেয়ারটার ওপরেই, কোনদিন আবার নিজের খাটটিতে এসে শোয়। এই সময়টুকু কেমন যেন অদ্ভুত মনে হয় অনিলকে। তবে

অনিলের আচরণের এই বিসদৃশতাটুকু এত অস্পষ্ট যে তা নিয়ে কোন অনুযোগ করা চলে না। অরুণার তো সাহসই হয় না প্রশ্ন করবার।

এমনি করে প্রায় একটা বছরই কেটে গেল।

কৃষ্ণা মধ্যে মধ্যে দেখা করতে আসে। কয়েক ঘণ্টার জন্যে সমস্ত বাড়িখানা গানে-গল্পে মাতিয়ে রেখে চলে যায়।

বরুণা নিয়ম করে চিঠি লেখে। কোন কোন চিঠির সঙ্গে শুভেন্দুও দু-এক লাইন লেজুর এঁটে দেয়।—'নতুন পেয়ে পুরোনোদের ভুলে গেলেন নাকি?' 'দুজনের নিভৃত নীড়টি ছেড়ে আমাদের পাঁচজনের মধ্যে আসছেন কবে?'—এমনি সব কথা।

অনিল এসব পছন্দ করে না। বরুণার তরফ থেকেও যাওয়ার জন্য তাগাদা আসে। অনিল তাতেও অপ্রসন্ন। বলে, 'আমাকে ছেড়ে তোমার একদিনের জন্যও কোথাও যাওয়া হবে না। সমস্তক্ষণ আমায় ঘিরে রাখতে হবে।'

কিন্তু অরুণা কারণ জানতে চাইলে তার কোন স্পষ্ট জবাব পাওয়া যায় না। তাই দূর থেকে যাকে সূর্যের মতন প্রদীপ্ত ও প্রখর মনে হয়েছিল, কাছে থেকে মাঝে মাঝে তাকে যেন কুয়াশার মতন রহস্যময় মনে হয়।

চিঠি লেখেন না কেবল সঞ্জীব। এমনকি দুর্গোৎসবের সময় মেয়েকে নিয়ে যাবার জন্যে লোকও পাঠাননি। পুজোর তত্ত্ব বাবদ হাজার খানেক টাকা পাঠিয়ে দিয়ে কর্তব্য পালন করেছিলেন।

তবু অরুণা সুখে ছিল। আপনার চারিপাশে ইন্দ্রজাল রচনা করে তারই ছটায় মুগ্ধ হয়ে ছিল। কিন্তু হঠাৎ তার এই সুখের স্বর্গে যেন ধুলোর স্পর্শ লাগল—অনিলের চিরাচরিত অভ্যাসগুলোয় কেমন এক রকম পরিবর্তন ঘটতে লাগল।

অনিল আজকাল সকাল এগারটার সময় বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়;

কোনদিন বিকেলের দিকে ফিরে আসে—কোনদিন একেবারে রাত্ত বারটা কি একটায়। শুধু তাই নয়, একটা ঘর সে নিজের জন্যে একেবারে আলাদা করে রেখেছে। অধিকাংশ দিন বাড়ি ফিরেই সোজা এই ঘরটিতে ঢুকে পড়ে। পোশাকগুলো ছেড়ে ক্লান্তভাবে একটা ইজিচেয়ারের ওপর বসে পড়ে, ঘণ্টার পর ঘণ্টা অন্যমনস্কের মতন কি যেন ভাবে। কখনও বা উঠে কিছুক্ষণ ভায়োলিন বাজায়; তারপর খাওয়া-দাওয়া সেরে একসময় হয়ত সেই ঘরেই শুয়ে পড়ে; আলো নিভিয়ে দেবার কথাটা পর্যন্ত মনে থাকে না। অরুণা প্রথম প্রথম সাহস করে ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ত, কিন্তু অনিলের কাটাকাটা, ছাড়াছাড়া কথাবার্তায় স্পষ্টই বোঝা যেতে লাগল যে অরুণার উপস্থিতিটা সে মনপ্রাণ দিয়ে স্বীকার করতে পারছে না। এই ভাবান্তরটুকু চোখে পড়বার পর অরুণা অনিলের এই ঘরটিতে আসা এক রকম ছেড়েই দিয়েছে।

কিন্তু কী অদ্ভুত অবস্থায় পড়ল অরুণা। আত্মীয়স্বজনের কাছে এসব কথা বলে সামান্য সহানুভূতি পাবারও আশা নেই। কারণ এ বিয়ের ইতিহাস সে রচনা করেছে নিজের হাতে। আজ সেটা নিয়ে কারও কাছে অভিযোগ অনুযোগ করতে গেলে নিজেকেই খাটো করা হবে। তা ছাড়া অনিলের যে সত্যিই কি হয়েছে তাও তো আজ পর্যন্ত ভাল করে বোঝা গেল না। এ নিয়ে অভিযোগ করবেই বা সে কিসের ওপর নির্ভর করে? কারণ, কথাবার্তার মধ্যে একটা দূরত্বের ভাব আর বাড়িতে আসা-যাওয়ার ব্যাপারে খানিকটা অনিয়ম ছাড়া আর কোন দিক্ থেকেই সে তার কর্তব্যের ক্ষেত্রে ক্রুটি ঘটতে দেয়নি। অরুণার কোথায় কখন কি প্রয়োজন সে সম্বন্ধে তার দৃষ্টি এখনও আগের মতই সজাগ আছে। জামা-কাপড়, রেডিও-টেলিফোন-মোটর কোন কিছুরই অভাব নেই অরুণার। প্রয়োজনের অতিরিক্ত ঝি-চাকর-বাবুর্চী তাদের জন্যে খেটে চলেছে। বাইরে থেকে দেখে কে বলবে

যে এই ছোট্ট পরিবারটির পর্যাপ্ত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের মধ্যে কোথাও ছন্দপতন ঘটেছে। রঙ্গমঞ্চের ফুটলাইটগুলো এখনও নানা রঙের আলো বিকীবণ করছে সন্দেহ নেই, কিন্তু যবনিকার অন্তরালের যে অংশটা সাধারণ দর্শকের দৃষ্টিগোচর নয় সেখানটা ধীরে ধীবে অন্ধকার হয়ে আসছে। প্রিয়জনের নিশ্চিত মৃত্যুর সম্ভাবনার মত অরুণা আজ যেন এটা নিঃসংশয়ে উপলব্ধি কবতে পারে, কিন্তু প্রতিকারের পথ খুঁজে পায় না।

এমন সময় একদিন কৃষ্ণা এসে হাজির। যে কথাটা অরুণা কিছুতেই ভাববার সাহস পাচ্ছিল না, কৃষ্ণা যেন তারই আভাস দিযে গেল।

একথা সেকথাব পব কৃষ্ণা বললে, 'একটা কথা বলব অরুণা, রাগ করবি না?'

—'না। বল।'

—'আমার পক্ষেও এটা কম লজ্জাব কথা নয়। তবু বলতে হবে।'

—'বলই না।'

—'অনিলমামাব সম্বন্ধে অদ্ভুত কতকগুলো কথা শুনতে পেলাম। কথাগুলো তোর কাছে লুকিয়ে রাখা আমার পক্ষে অন্যায় হবে। আমাব দাদার এক বন্ধু সম্প্রতি বিলেত থেকে ফিরেছেন। তোদেব বিয়ের কথা শুনে তিনি দাদাব কাছে বলেছেন, লণ্ডনে থাকতে একটি মেয়ের সঙ্গে অনিলমামার খুব জানাশুনো হয়েছিল; ইংরেজীতে যাকে বলে had an affair. দাদার বন্ধুটি যখন বিলেতে ছিলেন তখন নাকি তাদের বিয়ের কথাও শোনা গিয়েছিল। শেষ পর্যন্ত বিয়েও হয়েছিল বলে তাঁর বিশ্বাস।'

কৃষ্ণার কথাগুলো শেষ হবার পর অরুণা আর তার মুখের দিকে চাইতেও পারল না, পাথরের মূর্তির মতন স্তব্ধ হয়ে বসে রইল।

কৃষ্ণা বললে, 'অপ্রিয় কথাগুলো তোকে আমার কাছ থেকেই শুনতে হল। আমাকে তুই ক্ষমা করিস।'

কিন্তু অরুণা মনে মনে কথাটা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারল না। কে যেন তার কানের কাছে বারবার বলতে লাগল,—এ মিথ্যে, এ হতে পারে না। বিলেতে থাকতে অনিল বিয়েই যদি করে থাকে, তাহলে তাকে সে এমন করে বিপদে ফেলল কেন?

কেন, সেটা বোঝবার উপায় নেই। জিজ্ঞাসা করবার সাহস পর্যন্ত নেই অরুণার। সত্যি হোক, মিথ্যে হোক, এত বড় কঠিন আঘাত জীবনে সে কোন দিন পায়নি। মনের এই প্রচণ্ড আঘাত বাইরে তাকে একেবারে নির্বাক করে ফেলল। কোন একটা আশ্চর্য ভয়ে:সে যেন অসাড় হয়ে গেল। স্বামীব সম্বন্ধে যে একচ্ছত্র অধিকার সে এতদিন মনে মনে কল্পনা কবে এসেছে সেটা যদি সত্যিই ভেঙে যায় –বাস্তবের রূঢ় আঘাতে ভেঙে চুরমার হয়ে যায়···তা হলে সে দাঁড়াবে কোথায়? কার কাছে?

না, এত সহজে সে তাব সুন্দর পৃথিবীকে মিথ্যে হয়ে যেতে দেবে না! ধৈর্য, স্নেহ, সেবা, প্রেম দিয়ে অনিলের ক্ষত-বিক্ষত মনকে সে সুস্থ করে তুলবে।

দিন কয়েক পরে।

রাত অনেক হয়েছে। হঠাৎ অরুণার ঘুম ভেঙে গেল। আকাশের জ্যোৎস্না জানালার শার্সি দিয়ে বিছানার ওপর এসে পড়েছে। অরুণা পাশ ফিরে দেখল তার ডানদিকের বিছানা যথারীতি খালি। অনিল আজকাল ভেতর-বাড়িতে শুতে না এলেও তার বিছানা অরুণার ঘরেই আগের মতই পাতা থাকত। কিছুক্ষণ বিছানায় চুপ করে শুয়ে থাকবার পর অরুণার মনে হল, ড্রয়িং-রুম থেকে ভায়োলিনের সুর ভেসে আসছে! এমন প্রায়ই হয়। কিন্তু অরুণা বাইরের ঘরে যাওয়া দরকার মনে করে না; কেমন একটা সংকোচ হয়। আজ সে সংকোচ এড়িয়ে উঠে বসল। তারপবে সন্তর্পণে চলল ড্রয়িং-রুমের দিকে।

সুর ও বীণা

ড্রয়িং-রুমের দরজায় নেটের পর্দা ঝুলছে। ভিতরে হালকা নীল রঙের আলো। বাইরে থেকেই স্পষ্ট দেখা গেল, অনিল ইজিচেয়ারের ওপর অলসভাবে শুয়ে আছে। কোলেব ওপব ভাযোলিনখানা। সামনে টিপয়ের ওপব সোনালী ফ্রেমে বাঁধানো একখানা ফটো। অরুণা এর আগে কোনদিন এই ফটোখানা দেখেনি, ইদানীং সে এদিকে আসাই ছেড়ে দিয়েছে। টিপযের উপব একটা গ্লাস, গ্লাসে খানিকটা তরল পদার্থ। পাশে অ্যাশট্রেব ওপর ধূমাযমান সিগারেট।

অরুণা অনেক চেষ্টা করেও ঘরে ঢোকবাব সাহস পাচ্ছিল না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে সে নিজেব ঘবে ফেরবাব উপক্রম কবল। সেই সময ত়াব হাতের চুড়িগুলো শাড়িতে লেগে শব্দ করে উঠল। সে শব্দ অনিলের কানে গেল। একটুও বিচলিত না হযে অনিল ঘবের ভেতর থেকেই বললে, 'কে অরুণা ? এসো, ভেতরে এসো।'

অরুণা প্রায কাঁপতে কাঁপতে ঘবের মধ্যে এল। অনিল ঠিক তেমনিভাবে বসে থেকে সামনের একটা সোফা দেখিযে দিযে বললে, 'বসো।'

অরুণা সোফার এক প্রান্তে জড়সড় হযে বসল—যেন হঠাৎ কোন অপবিচিত পুরুষের সামনে এসে পড়েছে। মুখ নীচু করে সে একবাব টিপয়ের ওপর রাখা সেই ফটোটার দিকে চেয়ে দেখল। ইংলণ্ডের পল্লীপথের ধাবে একটা সাঁকো। সাঁকোর পাশে একটা গাছ যেন ফুলের ভাবে একেবাবে নুয়ে পড়েছে। তন্বী একটি ইংরেজ মেয়ে হাত বাড়িয়ে ফুল তোলবার চেষ্টা কবছে—তার সর্বাঙ্গে স্বাস্থ্যের পরিপূর্ণতা, চোখে-মুখে নবযৌবনের দীপ্তি।

অনিল একটু চুপ কবে থেকে বললে, 'তোমাকে কয়েকটা কথা অনেক আগেই বলা উচিত ছিল, কিন্তু হাজার চেষ্টা করেও পারিনি। আজ সেগুলো তোমায় শুনতে হবে।'

—'বলা কি একান্তই দরকার ?'

—'সব কথা শুনলে তুমি হয়তো আমায় খুব বেশী ভুল বুঝবে না। তারপরেও হয়তো আমাদের মনের মধ্যে ফাঁক থেকে যাবে। কিন্তু ফাঁকি থাকবে না।'

অনিল হাত বাড়িয়ে টিপয় থেকে গ্লাসটা তুলে নিল, তারপর বলতে লাগল, 'জীবনে দুটো জিনিস আমাকে পেয়ে বসেছে—সুর আর সুরা, আমাদের সভ্যতার দুটো আশ্চর্য আবিষ্কার। একটা আগেই জানতে, আব একটা আজ জানলে।'

হাতের গ্লাসটা অনিল শেষ করে ফেলল। অরুণা কঠিন দৃষ্টিতে চেয়ে রইল অনিলেব মুখের দিকে। কোলের ভায়োলিনটা নামিয়ে বেখে অনিল আবার বললে, 'বিলেতে গিয়েছিলাম ব্যারিস্টারী পড়তে। কিন্তু কয়েক মাস পরেই লণ্ডনের এক মিউজিক হলে এক রাশিয়ান ভায়োলিনিস্ট আমাব মাথা খারাপ করে দিলে। Lincolnss Inn ছেড়ে আমি বেহালা বাজানো শিখতে লাগলাম। সেই সময় সামনে এসে দাঁড়াল হার্টফোর্ডশায়াবেব একটি মেযে।'

টিপয়েব দিকে আঙুল দেখিয়ে অনিল বললে, 'মেয়েটির নাম অ্যান। তার আগে আমি জীবনে নারীর নৈকট্য এত ঘনিষ্ঠভাবে অনুভব করিনি। অ্যান আমাকে ধরে ফেলল। ভারতবর্ষকে এখনও ওদের অনেকে রূপকথার দেশ, শুধু রাজা-মহারাজার দেশ বলে ভাবে। আমি হলাম তার কাছে সেই রূপকথার দেশের রাজপুত্র। অ্যানের সংসারে আত্মীয়তার বালাই ছিল না, পোস্ট-ওয়াব ইংল্যাণ্ডের মেয়ে এই অ্যান; নীতিকে শ্রদ্ধা করতে শেখেনি। দুজনে বেরিয়ে পড়লাম কন্টিনেণ্ট টুর করতে।'

সোফার উপর অরুণার ক্লান্ত মাথাটা ধীরে ধীরে এলিয়ে পড়ছিল। অনিল সেটুকু লক্ষ্য করে বললে, 'আমি তোমায় বেশী কষ্ট দেব না অরুণা। লম্বা গল্প সংক্ষেপেই শেষ করব। বুদাপেস্তে একজন বড় ভায়োলিনিস্টের সঙ্গে আলাপ হল। তিনি আমাকে কেবল ভাল

করে ভায়োলিন বাজাতে শেখালেন না; সুরের সঙ্গে তাঁর কাছে আমি সুরার মন্ত্রেও দীক্ষা নিলাম; অর্থাৎ আধুনিকতার উগ্র বিষ পান করতে যতটুকু বাকি ছিল, তাও পূর্ণ হল।'

হাসবার একটু ব্যর্থ চেষ্টা করে অনিল বললে, 'এমনি করে বেশ কিছু দিন কাটল। তারপর অ্যান একদিন বিয়ের কথা পাড়লে।'

কথাটা বলতে বলতে অনিল চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল, 'ব্যাপারটা আমি কিন্তু সেদিক থেকে কোনদিন কল্পনা করিনি। বান্ধবী বা সঙ্গিনী হিসেবেই তাকে গ্রহণ করেছিলাম।'

অনিল জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। জানালার পাল্লা খুলে দিল। তারকা-বিচিত্রিত বিস্তীর্ণ আকাশ এখন ঘর থেকেই দেখা যাচ্ছে। অনিল অন্যমনস্কের মতন সেই দিকে চেয়ে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর আবার বলতে লাগল, 'অ্যানকে অস্বীকার করবার উপায় দেখা গেল না। সে ধরে নিয়েছিল আমি তাকে বিয়ে করব। কিন্তু 'লয়েডসে' হিসেব নিতে গিয়ে দেখলাম, আমার পৈতৃক সঞ্চয়ের প্রায় সবটাই আমি কন্টিনেন্টের বার আর হোটেলগুলোয় ছড়িয়ে দিয়ে এসেছি। হাতে যা অবশিষ্ট ছিল তা নিয়ে কোন ইওরোপীয়ান মেয়েকে বিয়ে করা চলে না। বাড়িখানা বিক্রি করে ফিরে যাব বলে কলকাতায় চলে এলাম।'

অনিল আলমারি থেকে একটা হুইস্কির বোতল বার করে আবার চেয়ারে এসে বসল। বোতলের তরল পদার্থ খানিকটা গ্লাসে ঢালতে ঢালতে বলল, 'ঠিক ছিল বাড়িখানা বিক্রি করে টাকাকড়ি যোগাড় করতে পারলেই ফিরে যাব। কিন্তু হল না।'

গ্লাসের হুইস্কিটুকুতে চুমুক দিয়ে আবার বললে, 'সিমলা পাহাড়ে তোমার সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।'

অনিল সিগারেট কেস থেকে সিগারেট বার করে ধরাল। তারপর অস্বস্তিকর নীরবতা। অরুণার মনে হতে লাগল, তার দেহের একটা অংশ যেন ধীরে ধীরে অবশ হয়ে আসছে, বেশীক্ষণ আর সোজা হয়ে

বসতে পারবে না। তন্দ্রাগ্রস্তের মতন ক্ষীণকণ্ঠে প্রায় অস্ফুচ্চারিতভাবে অরুণা বললে, 'এসব কথা তুমি আগে বলোনি কেন? আমি তোমায় ধরে রাখতাম না।'

—'সেই ভয়েই তো কোন কথা তোমায় খুলে বলতে পারিনি। তোমাব কাছ থেকে আমায় দূরে সবে যেতে হয়, এ আমি চাইনি। বিশ্বাস করো।'

অরুণা ব্যঙ্গের হাসি হেসে বললে, 'অ্যানকেও তো তুমি ঠিক এই কথাই বলেছিলে?'

—'বলেছিলাম। কিন্তু তখনও তোমাকে দেখিনি।'

অরুণা অল্পক্ষণ চুপ কবে থেকে বললে, 'আমার ঘুম পাচ্ছে।'

অনিল বললে, 'আমারও। তোমাকে সব কথা বলতে পেরে খুব হালকা মনে হচ্ছে নিজেকে। আমি কিন্তু ঘুমোব না। সারা রাত ধবে বাজাব।'

ভায়োলিনটা তুলে নিযে বাজাতে লাগল অনিল; কিন্তু ঘরের অস্বস্তিকব পরিবেশেব মধ্যে বেশীক্ষণ ভাল লাগল না। ভায়োলিনটা নামিয়ে রেখে অনিল হঠাৎ বললে, 'আসল কথাটাই তোমায় বলা হল না। আমি নিজেকে প্রায নতুন করে গড়ে এনেছিলাম অরুণা। তোমার সঙ্গে দেখা হবার পব থেকে দিন কয়েক আগে পর্যন্ত মদের গ্লাস আমি হাতে করিনি। ক্লাবের বন্ধুরা আমাকে স্ত্রৈণ বলে তামাসা করেছে। ...তারপব হঠাৎ সেদিন অ্যানের একখানা চিঠি পেলাম। আমার ফিরতে এই অস্বাভাবিক দেরি দেখে ও বীতিমত বিচলিত হয়ে উঠেছে; অনুযোগ, অভিযোগ...অনেক কিছুই ছিল চিঠির মধ্যে। আসবার সময় কিছু দেনা বেখে এসেছিলাম, তার জন্যে সে নাকি বন্ধু মহলে মুখ দেখাতে পারছে না, তাছাড়া সে নিজেও নাকি চারদিক থেকে আর্থিক অসুবিধেয় জড়িয়ে পড়েছে। কথাগুলো সত্যি হোক আর মিথ্যে হোক, আমি তার প্রতি অবিচাব করিনি অরুণা।

বাড়িখানা বন্ধক রেখে পঁচিশ হাজার টাকার একখানা ড্রাফট তার ঠিকানায় পাঠিয়ে দিয়েছি।'

অরুণা কেবল বলতে পারল, 'বাড়ি বন্ধক রেখে!'

অনিল বললে, 'হ্যাঁ। টাকা যোগাড় করবার আব কোন উপায় ছিল না আমার। রূপকথার দেশের রাজপুত্রকে আমি ওদের কাছে ছোট হতে দিতে পারলাম না।'

অনিলের কথা শেষ হবাব সঙ্গে সঙ্গে দেখা গেল, অরুণার মাথা সোফার ওপর এলিয়ে পড়েছে; হাত দুটি মুঠো করা, চোখ দুটি বন্ধ। অনিল ব্যাকুল হযে ডাকল, 'অরুণা,...'

অরুণার সাড়া পাওয়া গেল না। অনিল ড্রয়ার খুলে স্মেলিং সল্টের শিশি বাব কবল। সেটা মিনিট কয়েক অরুণাব নাকের কাছে ধরবাব পব অরুণা স্বপ্নাচ্ছন্নের মত উঠে বসল। ঘবের দেয়াল থেকে শুরু করে আসবাবপত্রগুলো পর্যন্ত...সব, সব তার কাছে একেবারে অচেনা আর অদ্ভুত বলে মনে হচ্ছে। ভীতিবিহ্বল চোখে চারদিকে চাইতে চাইতে হঠাৎ সে দু'হাত দিযে অনিলকে জড়িযে ধরল, তারপর অসহায় কণ্ঠে বললে, 'আমাব বড্ড ভয় করছে। ঘরে চল।'

নিজের ঘরে গিয়েও অরুণা ভাল করে ঘুমোতে পারল না। সমস্ত রাত্রি ধরে বিদেশিনী একটি মেযের প্রেতচ্ছায়া যেন তার তন্দ্রা এবং স্বপ্নকে কণ্টকিত করে রাখল।

রাত কোন রকমে ভোর হল।

সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠে অনিল চায়ের টেবিলে বসে খবরের কাগজ পড়ছিল। মনের অস্বস্তি চাপা দিতে হলেই অনিল কিছু একটা পড়বার চেষ্টা করে। অরুণাকে যে চায়ের টেবিলে দেখা যাবে এতটা আশা সে করেনি। কিন্তু একটু পরেই বেয়ারার পিছনে পিছনে

সত্তস্নাতা অরুণাকে আসতে দেখে অনিল রীতিমত আশ্চর্য হয়ে গেল। কুণ্ঠিতভাবে তার দিকে চেয়ে বললে, 'এখন কেমন বোধ করছ?'

চা ঢালতে ঢালতে অরুণা বললে, 'ভাল।'

সকালে উঠেই অরুণা মন ঠিক করে ফেলেছে। ঠিক করেছে, বিদেশিনী সেই মেয়েটির কাছে কিছুতেই সে হার স্বীকার করবে না। নিজের দুঃখ ও বেদনা, স্নেহ ও প্রীতি, ধৈর্য ও সাধনা দিয়ে শেষ পর্যন্ত সে চেষ্টা করে দেখবে, অনিলের মন থেকে তার স্মৃতি নিঃশেষে মুছে দেওয়া যায় কিনা!

অনিল খবরের কাগজের পাতার দিকেই চোখ রেখে বললে, 'আমি কিন্তু খুব ভয় পেয়েছিলাম।'

অরুণা মধুর একটু হেসে জবাব দিল, 'সকাল বেলা ঘুম থেকে উঠেই মনে হল, কাল রাত্রে আমি শুধু স্বপ্ন দেখেছিলাম।'

অনিল বললে, 'স্বপ্নই হোক অরুণা…আমি যেন তোমার যোগ্য হতে পারি। চল, দিন কতক আমরা কলকাতার বাইরে কোথাও বেড়িয়ে আসি।'

—'কোথায় যাবে বল।'

—'যেখানে তোমার খুশি। কাশ্মীর কিংবা ওয়াল্টেয়ার, সিমলা কিংবা নৈনীতাল। আমার স্বভাবটা তো জান, বেশীদিন একজায়গায় থাকলে যেন হাঁফিয়ে উঠি।'

আর্থিক অসাচ্ছল্যের জন্য বাইরে যাওয়া অবশ্য তখনই ঘটে উঠল না, কিন্তু জীবনের সহজ সুরটা যেন ফিরে এল। অরুণার বিবর্ণ দিনরাত্রিগুলি যেন নতুন রং লেগে উজ্জ্বল হয়ে উঠতে লাগল। সন্ধ্যায় দুজনে সিনেমায় যায়, কিংবা থিয়েটারে। এক একদিন মোটরে উইলিংডন ব্রীজ, কিংবা একেবারে ডায়মণ্ড হারবার পর্যন্ত। অনিল নিজেই মোটর চালায়। বাড়ি ফিরে অরুণা এক একদিন রবীন্দ্রনাথ কিংবা সুইনবার্নের কবিতা পড়ে শোনায় অনিলকে; কোনদিন অনিল

বেহালা বাজায়, অরুণা সেলাই করতে করতে শোনে। কিন্তু এতেও যেন তৃপ্তি পাওয়া যায় না। অনিলের মনের বে-হিসেবী দেবতা দিন কয়েক পরেই আবার তাকে অস্থির করে তোলে। ব্যাঙ্ক থেকে আরও কিছু টাকা ওভারড্রাফট নিয়ে অনিল ঘরের বাইরে বেরিয়ে পড়ে— অবশ্য অরুণার সঙ্গে। কখনও ডাল হ্রদের বোট-হাউসে, কখনও ভীম তাল, নৈনীদেবীর মন্দির দেখে কাটিয়ে দিলে তারা প্রায় ছ-মাস। অনেকগুলো কারেন্সী নোট এই ছ-মাসে ধোঁয়ার মতন হাওয়ার সঙ্গে মিলিয়ে গেল।

ঋতুর চাকা ঘুরতে ঘুরতে কেটে গেল আরও একটা বছর।

বেগমপুরের সঞ্জীব রায় তাঁর বড় মেয়ে অরুণার সম্বন্ধে বাইরে যতই ঔদাসীন্যের পরিচয় দিন না কেন, মনে মনে তিনি তার জন্যে অনেকখানি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনের এই অবরুদ্ধ উদ্বেগটা একদিন রাত্রিতে ভীষণ একটা দুঃস্বপ্নের আকারে তাঁর ঘুমের ব্যাঘাত ঘটিয়ে বসল। তাড়াতাড়ি বিছানায় উঠে বসে তিনি পুরো এক গ্লাস জল খেয়ে বসলেন। অত রাত্রে আর কারও ঘুম তিনি ভাঙ্গালেন না বটে, কিন্তু পরদিন সকালে উঠেই তিনি রামচরণকে ফার্স্ট ট্রেনে কলকাতায় পাঠিয়ে দিলেন; সেই সঙ্গে গেল বরুণার একখানা চিঠি। বলা বাহুল্য, হাতের লেখাটাই বরুণার, বক্তব্যটা সঞ্জীব রায়ের। অরুণা যেন রামচরণের সঙ্গে চলে আসে, কোন রকম ওজর-আপত্তি না করে এই হল চিঠির আসল কথা।

রামচরণকে দেখে অরুণা খুশীতে উথলে উঠল।

—'হঠাৎ আমার খোঁজ পড়ল চরণকাকা?'

হঠাৎ খোঁজ পড়বার কারণটা রামচরণের মোটেই জানা ছিল না। তিনি মাথা চুলকোতে চুলকোতে বললেন, 'মনিবের মনের কথাটাই যদি জানতে পারব তা হলে তো পেনসনের দরখাস্ত করতাম বড়মা।

কিন্তু যাওয়া তোমার চাই-ই। নইলে হাতে আমার মাথা কাটবেন। ছোটমা বলছিলেন, বড় জামাইবাবুরও যাওয়া চাই।'

অনিল কিন্তু নিজে যেতে রাজী হল না। অরুণা একাই গেল।

যাবার আগে অরুণা জিজ্ঞাসা করলে, 'আমাদের সেই ন্যাস্টি পাড়া-গাঁয়ে যাবে তো মাঝে মাঝে? নইলে আমি মন ঠিক করে থাকতে পারবো না।'

অনিল বললে, 'মাঝে মাঝে যেতে হবে বইকি।'

স্টেশনে গিয়ে সে অরুণাকে ট্রেনে তুলে দিল। কিন্তু গাড়ি ছাড়বার ঠিক আগেব মুহূর্তটিতে সামান্য একটা ঘটনায় অরুণার মনটা ভয়ানক খারাপ হয়ে গেল।

গার্ড হুইসল দিয়েছে, গাড়ি ছাড়বাব শেষ ঘণ্টা পড়েছে। অনিল ট্রেনেব কামরা থেকে নেমে দবজাটা বন্ধ কবে দিল। ট্রেন তখন ধীবে ধীরে চলতে শুরু করেছে। অনিল যাবাব জন্যে ঘুরে দাঁড়াতেই দেখা গেল, তার কোটের প্রান্তটা দবজায় আটকে গেছে। অরুণা শঙ্কিত হয়ে উঠল। কিন্তু ব্যাপাবটা কিছুই নয়; অনিল তাড়াতাড়ি দরজা খুলে কোটটা ছাড়িয়ে নিল, তারপব হাত তুলে বিদায় জানাল অরুণা আর রামচরণকে।

অরুণা বিবর্ণমুখে হাসবার চেষ্টা কবল।

গাড়ি চলে গেল।

অরুণা যখন বাড়ি পৌঁছাল তখন রাত হয়েছে। মনে ভেবেছিল, এতদিন না আসাব জন্য সঞ্জীব নিশ্চয়ই সস্নেহে নানারকম অনুযোগ করবেন, কিন্তু সঞ্জীবের তরফ থেকে সেরকম কোন উৎকণ্ঠা বা আতিশয্যের পরিচয় পাওয়া গেল না। তিনি কেবল ভাল করে একবার মেয়ের দিকে চাইলেন, তাবপর বললেন, 'বিয়ে দিলে মেয়ে পর হয়ে যায়, এ কথা তুমিই আমায় প্রথম শেখালে মা। যাক, ভাল ছিলে এও ভাল।'

প্রায় ছু-বছর পরে বাপের বাড়ি এসে এই নিষ্প্রাণ সংবর্ধনায় অরুণা বেশ একটু ক্ষুণ্ণ হল ; অভিমান হল তার চেয়ে বেশী। সে চুপ করেই রইল।

শুভেন্দুর সঙ্গে দেখা হতে সে বললে, 'বেগমপুরের বরাত ভাল। ছু-বছর পরে তবু একবার আসবার সময় পেলেন।'

অরুণাও পালটা খোঁচা দিলে, 'এসে দেখলাম, সময় না পেলেই ভাল ছিল।'

শুভেন্দু বললে, 'কেন ?'

অরুণা বললে, 'সংবর্ধনার যা ঘটা !'

—'ঘটাটাই তো সংবর্ধনার সব নয় অরুণাদি। আপনার বাবাকে তো আপনারই সবচেয়ে বেশী করে চেনা উচিত। উনিই আপনাকে আনতে পাঠিয়েছিলেন।'

অরুণা আর কোন জবাব না দিয়ে নিজের ঘবে চলে গেল। বরুণার সঙ্গে দেখা হল সেইখানেই। সে নিজের হাতে দিদির ঘব গুছিয়ে রাখছিল।

—'ভাল ছিলে তো দিদি ?'

—'খুব।'

—'একলা একলা খুব দেশ-বিদেশ ঘুবে বেড়ালে যা হোক। আমি সেই আদ্যিকালের চেনা বাড়িটিতে।'

—'চেনা বাড়িই তো ভাল ভাই, তাতে বুড়ো বাপের চক্ষুশূল হতে হয় না।'

—'তুমি রাগ করছো দিদি !···বাবাকে তো জান···'

—'হয়তো জানতাম।'

বলে অরুণা মুখ ভার করে বসে রইল।

বরুণা বললে, 'লক্ষ্মী ভাই দিদি, রাগ কোরো না। বাবার মুখের কথাগুলোই বেয়াড়া, মনে মনে তিনি তোমার জন্যে—'

অরুণা এবারও চুপ করে রইল।

এদিকে অরুণা বাপের বাড়ি যাবার পর অনিল যেন নিজের দিকে তাকাবার ভাল করে অবসর পেল। সিমলা পাহাড়ে মিঃ ঘোষের কটেজের বারান্দায় যেদিন সে অরুণার মুখের ওপর প্রথম দৃষ্টিপাত করেছিল সেদিন থেকে তার ভাগ্যের চাকা কি অবিশ্রান্তভাবে ঘুরছে। তুটি চোখের গভীর আয়ত দৃষ্টি যে আর একটি মুখকে এমনিভাবে আড়াল করে দিতে পারে, সেকথা অনিল আগে কখনও ভাবেনি। হার্টফোর্ডশায়ারের অ্যান মেয়েটি তাকে চঞ্চল করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। প্রথম যৌবনের সমস্ত আবেগ ও উত্তেজনা নিয়েই সে তার সঙ্গ কামনা করেছিল। দেশে ফিরেও তার মনে হয়নি যে তার ইওরোপ-জীবনের ওপর সমাপ্তির পূর্ণচ্ছেদ পড়েছে। অথচ ঘটনাচক্রে হয়ে গেল ঠিক তাই। সিমলা পাহাড়ের মেঘচ্ছায়া ম্লান আকাশের নীচে অরুণার মুখের দিকে চাইতেই মনে হল, তার পূর্বজীবনের সব কিছুকে ভুলিয়ে দিয়ে নতুন সূর্য উঠছে, শুরু হচ্ছে তার নতুন জীবন। এই উপলব্ধির মধ্যে এতটুকু ছলনা বা প্রতারণা ছিল না। কিন্তু মানুষ তার নিজের মনকে কতটুকুই বা বুঝতে পারে। তাই যেদিন অ্যান তাকে চিঠি লিখল, সেদিন কেমন করে জানি না, কন্টিনেন্টের সেই হারানো দিন-রাতগুলো অনিলের মনে আবার যেন কলরব করে উঠল। বুদা ও পেস্ত শহরের মাঝখানে যে সেতুটা আছে সেখানে দাঁড়িয়ে কত রাত্রে তারা ভবিষ্যৎকালের স্বপ্ন দেখেছিল, বুড়ো হাঙ্গেরিয়ান প্রফেসারের সঙ্গে কেমন করে সে রাত্রির পর রাত্রি কাফে আর ক্যাবারেগুলোয় ঘুরেছে, আর অ্যান কেমন করে তন্ময় হয়ে শুনতো গুরু-শিষ্যের সেই সব আলাপ-আলোচনা...সব, সব নতুন করে মনে পড়ে গেল অনিলের।

দাম্পত্য-জীবনের সাধারণ রীতি বিসর্জন দিয়ে সে অ্যানের চিঠির

উত্তর দিয়েছিল ; এমন কি সেই সঙ্গে পঁচিশ হাজার টাকাও পাঠিয়েছিল। নিরাসক্ত মন নিয়ে ভাবলে, এর কোন প্রয়োজনই ছিল না ; কিন্তু পৃথিবীতে যে-সব মানুষ হিসেবের চুলচেরা পথ দিয়ে চলাফেরা করে, বিয়ের পর বড় চাকরি পায়, সন্তান উৎপাদন করে ; তারপর রাশি রাশি টাকা সঞ্চয় করে একদিন মরে যায়, বিধাতা পুরুষ অনিলকে তাদের দলে টানেননি। বিংশ শতাব্দীর সমস্ত উগ্র উত্তেজনাকে সে তার স্নায়ু ও শিরা দিয়ে অনুভব করেছে। যেখানে প্রয়োজনের খাতিরে ছোট হওয়া দরকার সেখানেও সে অনাবশ্যক রকম বড়, অকৃপণ এবং উদার। তাই বাড়ি বাঁধা রেখে অ্যানকে অতগুলো টাকা পাঠাবার পরেও অরুণাকে সঙ্গে নিয়ে দেশের অর্ধেকটা ঘুরে বেড়াতে সে ইতস্ততঃ করেনি। ছেলেবেলা থেকেই তার মনের মধ্যে কোথায় যেন একটা আত্মস্ফীত অহংকারের ভাব আছে ; সে ভাবটাই তাকে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে খাপ খাইয়ে চলতে দেয় না। বারে বারে সে বিপদের মধ্যে পা বাড়ায়, বার বার ভুল করে। এতদিন বিপদগুলো এসেছেও যেমন, কেটেও গিয়েছে তেমনি অনায়াসে। কিন্তু অরুণা বেগমপুরে যাবার পর ব্যাঙ্কের হিসেব দেখতে বসে তার বুকের ভেতরটা পর্যন্ত কেঁপে উঠল। চল্লিশ হাজার টাকা ওভার-ড্রাফ্‌ট—ব্যাঙ্ক এ পর্যন্ত আপত্তি করেনি, কারণ বাড়িখানা ব্যাঙ্কের কাছেই বন্ধক আছে এবং তারা এতদিন বাড়িখানার ওপর নির্ভর করেই টাকা জুগিয়ে এসেছে। কিন্তু আর কতদিন ? এইবার একদিন হিসেব-নিকেশের জন্য কড়া তাগাদা আসবে নিশ্চয় !

কিন্তু অনিল করবে কি ? বাড়িখানা বিক্রি করে দিলে এখনও যে কয়েক হাজার টাকা পাওয়া যায় তাই সম্বল করে পঁচিশ-ত্রিশ টাকা দিয়ে বাঙালী পল্লীতে একটা ফ্ল্যাট ভাড়া করবে ? ভবিষ্যতের দিকে চাইতে গেলে এই রকম একটা পথই নজরে পড়ে। কিন্তু ভবিষ্যতকে অনিল জীবনে কোনদিন স্বীকার করেনি। তার সমস্ত জীবন—এতদিন

পর্যন্ত গড়ে উঠেছে বর্তমানের কতকগুলো খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত মুহূর্ত নিয়ে। বিশ-বাইশ বছর থেকে সে শুধু কতকগুলি ক্ষণস্থায়ী মুহূর্তের উপাসনা করে আসছে। সেখানে অতীতের অন্ধকার নেই, ভবিষ্যতের প্রত্যাশাও নেই। রঙীন কতকগুলো মুহূর্তের চশমা চোখে দিয়ে সে জীবনকে দেখেছে কোন প্রতিভাধর শিল্পীর আঁকা মনোহর একটি ছবির মতন করে। সেখানে সংকীর্ণতার জঞ্জাল নেই ; সে ছবির ক্যানভাস যেমন বিচিত্র ; তেমনি বিস্তীর্ণ। তাকে সে টুকরো করে ভাঙবে কি করে ?

কিন্তু প্রয়োজনের খড়েগর কাছে সবাইকে নিরীহ ছাগশিশুর মতন মাথা নীচু করতে হয়। রঙীন মুহূর্তগুলি ধীরে ধীরে অস্পষ্ট হয়ে আসে ; সামনে দেখা দেয় বিবর্ণ, বিশীর্ণ, ভয়াবহ ভবিষ্যত।

অনিল চাকরির চেষ্টায় ঘুরে বেড়াতে শুরু করল। কোন একটা বড় হোটেলে কিংবা রেডিও-স্টেশনে অর্কেস্ট্রা-কণ্ডাক্টার, কিংবা কোন বড়-লোকের বাড়িতে গৃহশিক্ষক। সন্ধানও দু-একটা মেলে। কিন্তু অনিল কিছুতেই তাদের প্রস্তাব ও শর্তগুলোয় রাজী হতে পারে না। সে সব প্রস্তাবে রাজী হলে আত্মস্বাতন্ত্র্য বলতে কিছু থাকবে না। সাধারণ অর্কেস্ট্রা দলের ভিড়ের ভেতর বসে বেহালা বাজাতে হবে। পারিশ্রমিকের অঙ্কটা একশো টাকার ওপর উঠবে কিনা সন্দেহ।

অনিল এতকাল স্বপ্ন দেখেছে আলোয় উদ্ভাসিত মিউজিক হলের ; ...প্যারী, ভিয়েনা কিংবা বুদাপেস্তের জনাকীর্ণ অপেরা-হাউসের—সমস্ত অডিটোরিয়ামে মসৃণ ভেলভেট আর কালো সাটিনের খসখস মৃদু শব্দ, হীরার ব্রোচ আর নীলার আংটির প্রখরদ্যুতি : প্রকাণ্ড রঙ্গমঞ্চের একধারে একা দাঁড়িয়ে ভায়োলিনের বুকে সে নিজে তুলছে সুরের ঝড় ; সে ঝড়ের ঝংকার বিস্তার লাভ করতে করতে ভেসে যাচ্ছে উপরের সিলিংএর বহুমূল্য কাটগ্লাসের ঝাড়গুলোর কাছে—সমস্ত প্রেক্ষাগার স্তব্ধ হয়ে তার বাজনা শুনছে, সমবেত জনতার নিশ্বাসের শব্দ পর্যন্ত

যেন থেমে গিয়েছে।...কল্পনার সেই বিচিত্র রঙ্গভূমি থেকে নেমে এসে অনিল নিজেকে সাধারণ অর্কেস্ট্রা-পার্টির নাম-না-জানা বেহালা-বাজিয়ে হিসেবে কিছুতেই কল্পনা করতে পারে না।

দেনার অঙ্ক বেড়েই চলে।

মোটরের কয়েকটা কিস্তি বাকী পড়ায় কোম্পানির লোক এসে একদিন গাড়িখানা নিয়ে গেল। অনিল মনে মনে স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে ভাবল : যাক, আর পেট্রোলের ভাবনা ভাবতে হবে না।

মাসখানেক পরেই ব্যাঙ্ক থেকে তাগাদা এল হিসেব-নিকেশ করবার। একখানা চেকও ফিরে এল নামঞ্জুর হয়ে। বাড়িতে কিছু টাকা তখনও ছিল। অনিল হুইস্কি আনতে দিল।

অরুণা চলে যাবার পর মাস দুয়ের মধ্যে অনিল তাকে একখানা চিঠি লেখবার উৎসাহ পর্যন্ত খুঁজে পেল না। কোন যে কারণ ছিল তা নয়, কেবল একটা নিষ্ক্রিয়তা আর আলস্যের ভাব ধীরে ধীরে তার মনটাকে আচ্ছন্ন করে ফেলছিল। কি লিখবে অরুণাকে? ভাল আছি, চিন্তার কোন কারণ নেই? না, অকারণে সে বানিয়ে বানিয়ে এতগুলো মিথ্যে কথা লিখতে পারবে না। তার চেয়ে চুপ করে থাকাই ভাল।

সেদিন বিখ্যাত একটি হোটেলের কর্তা দেখা করবার জন্যে অনিলকে ডেকেছিলেন। অনিল তাঁর সঙ্গে দেখা করল। কিন্তু কোন সুরাহা হল না। নিরুৎসাহ মনে অনিল ট্রামে চড়ে বাড়ি ফিরছিল। এই ট্রামেই দেখা হয়ে গেল ছেলেবেলার বন্ধু নরেশের সঙ্গে। নরেশ দিব্যি মোটাসোটা আর ভারিক্কি হয়েছে; পাঞ্জাবির নীচে ভুঁড়ির আভাসও পাওয়া যায় একটু। মাথার সামনের দিকটা বড় বড় চুল, পিছনের দিকটা একেবারে চাঁচাছোলা। অনিলকে দেখে সে খাতির করবার জন্যে রুপোর পানের কৌটোটা এগিয়ে দিল। অনিল হাসতে হাসতে জানাল, পান সে খায় না।

—'তারপর কলকাতায় ফিরে এলে কবে ?'

—'বছর দুই আগে। তুমি এদিকে কোথায় ?'

—'মাঠে।'

—'মানে, রেসে ?'

—'তা ছাড়া আর কোথায়। যে মাঠে গরু চরে, ঘোড়ায় শুধু ঘাস খায় সেখানে যাবো কোন্ দুঃখে ? কিন্তু তোমাদের মতন আপটুডেট ছেলে—তুমি রেসে যাও না নাকি ?'

—'ইচ্ছে যায়নি কোন দিন। নইলে আর কোন আপত্তি নেই।'

—'বেশ তো, চলো না। এত বড় স্পোর্টস আর নেই হে। তোমরা পয়সাওলা লোক, তোমরাই তো যাবে। টাকায় টাকা বাড়ে, এটা জানো তো ? সঙ্গে আছে কত ?'

—'বিশেষ কিছু নয়। বড় জোর শ' খানেক।'

নরেশ চোখ বড় বড় করে বললে, 'বিশেষ কিছু নয় মানে ? ওতেই আমি হাজার খানেক টাকা জিতে আসতে পারি।'

কথায় কথায় সেইদিনই নরেশ অনিলকে রেসকোর্সে টেনে নিয়ে গেল। কদিন থেকে ভারি একঘেয়ে লাগছিল, অল্প কয়েকটা টাকা খরচ করে কিছুক্ষণ যদি অন্যমনস্ক থাকা যায় এবং সেই সঙ্গে কিছু অর্থাগমও হয়, এই সব সাত-পাঁচ ভেবে অনিলও রাজী হল। কথায় আছে, আনাড়ী লোক প্রথম দিন মাঠে গেলে জিতে যায়। কথাটা যে সত্যি তারই প্রমাণ হিসেবে যেন অনিলও সেদিন জিতে গেল।

নরেশ উৎসাহ দিয়ে বললে, 'দেখলে তো, টাকায় টাকা বাড়ে।' একটু চুপ করে থেকে আবার বললে, 'If you don't mind, আমায় গোটা পঁচিশ টাকা ধার দাও। আসছে শনিবার তোমায় ফেরত দেব। আমার টাকাগুলো তো সব ফাঁক হয়ে গেল। পরের শনিবার একেবারে তৈরী হয়ে এসো। 'গ্র্যাণ্ডের' সামনেই দেখা হবে। পাকা খবর নিয়ে আসব, ট্রেবল না মিলিয়ে বাড়ি ফিরব না।'

অনিলের জিত হয়েছিল শ'দুই টাকা। পঁচিশটি টাকা নরেশকে সে খুশী মনেই দিল।

মদের মতন এই ঘোড়দৌড়েও চমৎকার একটা উত্তেজনা আছে। একটা নির্দিষ্ট গণ্ডীব মধ্যে নানা দেশের নানা জাতের নানা ধর্মের এবং নানা বয়সের লোকেব কী বিচিত্র সমাগম। জকিদের বিচিত্র পোশাক, নানা কণ্ঠের অদ্ভুত কোলাহল, মনোভঙ্গের দরুন হতাশা, তিথি-নক্ষত্র, দিন-ক্ষণ, ঘোড়ার নম্বব প্রভৃতি সম্বন্ধে অদ্ভুত কুসংস্কার···কাউণ্টারে কাউণ্টারে কবকরে নোট আব ঝকঝকে টাকার লেনদেন···সব মিলে এ যেন সুরার চেয়ে উগ্র, রমণীর চেয়েও রমণীয়।

দেখতে দেখতে এই মোহ অনিলকেও পেয়ে বসল। এই পথেই সে তার হারানো সৌভাগ্য আব সমৃদ্ধিকে ফিরিয়ে আনবে।

সমস্ত সপ্তাহ ধরে টার্ফ নিউজ, খবরের কাগজের সুকৌশল প্রচাবকার্য আর রেসিং গাইডের বেকর্ড হিসেব কবে সে পরবর্তী শনিবারেব অপেক্ষা কবতে লাগল।

গ্র্যাণ্ডের প্রবেশ-পথে সেদিন কিন্তু নবেশকে দেখা গেল না। না থাক, অনিল নিজেই ঢুকে পড়ল। তারপব বিচিত্র উত্তেজনায় মধ্যে ঘণ্টা তিনেক কাটিয়ে সে যখন বাইরে এসে দাঁড়াল, তখন আগের দিনেব লাভের অঙ্কটা পর্যন্ত বেমালুম সাফ হয়ে গেছে।

ফেরবার পথে ট্রামেই নরেশের সঙ্গে দেখা। অনিলের মন্দ ভাগ্যের জন্য দুঃখ প্রকাশ করে সে জানিয়ে দিল যে সঙ্গে টাকা ছিল না বলেই সে আর সাহস করে গ্র্যাণ্ডে যায়নি। কিন্তু এই সামান্য ক্ষতিতে অনিলের ভেঙে পডলে চলবে না; আসছে শনিবার এ-সিজ্‌নের ফাইনাল মিটিং, সেদিন সে অনিলের লোকসান সুদ্ধ উসুল কবে দেবে। জকি ট্যানার তাদেব অফিসেব বড়ো সাহেবেব বন্ধু, সে নাকি একেবারে তার কাছ থেকে ফাস্টহ্যাণ্ড খবর নিয়ে আসবে। তা ছাড়া জকি ম্যাকশার্প যে হোটেলে বিলিয়ার্ড খেলতে যায় তাদের মার্কারের সঙ্গে

নরেশের আলাপ নাকি প্রায় বন্ধুত্বের পর্যায়ে পৌঁচেছে ; ইচ্ছে করলে সেখান থেকেও কিছু পাকা খবর সংগ্রহ করে আনতে পারা যায়।

বাড়িতে ফিরে শূন্য ঘরে মদের গ্লাস হাতে করে অনিল সেদিনের ক্ষতিব কথাটা ভুলে গেল। আগামী দিনের প্রত্যাশা-উজ্জ্বল একখানি ছবি অনবরত তার চোখেব সামনে ভাসতে লাগল।···রাশি বাশি টাকা, ঝকঝকে টাকা, করকবে কাবেন্সী নোটে তাব দু'-পকেট বোঝাই হয়ে যাবে, আব সেই টাকাটাই নানাভাবে ইনভেস্ট করে, নিজের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট সে আবার ফাঁপিযে তুলবে।···কিন্তু তার আগে আগামী শনিবাবেব জন্য মোটামুটি কিছু টাকা যোগাড কবা চাই, একশ' দুশ' একহাজার।

বন্ধুমহলে অনিলেব আর্থিক সম্ভ্রম তখনও কিছু ছিল। টাকাটা যোগাড হযে গেল, বিনা হ্যাণ্ডনোটেই। সুদও দিতে হবে না। তবে ফেবত দেওযা চাই। বন্ধু বড ব্যবসাযী···টাকাটা বেশী দিন ফেলে বাখা তাব পক্ষে মোটেই সম্ভব নয।

বেসকোর্সেব গ্র্যাণ্ড স্ট্যাণ্ডেব প্রবেশ-পথে শনিবাব দিন নরেশকে উদ্‌গ্রীব হযে অপেক্ষা করতে দেখা গেল। আজ সে কোটপ্যাণ্ট পরে বাতিমতো সাহেব সেজে এসেছে। অনিল আসতেই সে সোৎসাহে পানের ডিবে বার করল। অনিল সেদিকে দৃষ্টি পর্যন্ত না দিয়ে নরেশকে নিযে ভেতবে ঢুকে পডল।

ভেতবে এসে নবেশ বললে, 'অফিসেব বড সাহেব বা জকি ম্যাকশার্পের পরিচিত মার্কার কারুর কাছেই কোন খবব যোগাড করা সম্ভব হযনি। কিন্তু তাতে কিছু যায আসে না। সাহেব তাকে বেট যেব প্রতি লক্ষ্য রেখে খেলতে বলেছেন। এবং এও বলে দিযেছেন যে এতে নাকি মাব নেই।

কিন্তু বেটিংযের ব্যাপাবে 'বুকে' যে সব কৌশল অবলম্বন করা হয অনিল বা নরেশের তার বিন্দুমাত্রও জানা ছিল না। যে ঘোড়ার বাজী

জেতবার সম্ভাবনা প্রায় ষোল আনা সেটার ওপর ধরা বাজীর ডিভিডেণ্ড যাতে কমে না যায় তার জন্য বুকমেকাররা সব সময় ফল্‌স্‌ বেটিংয়ের কৌশল প্রয়োগ করে। কৌশলটা আর কিছুই নয়, যে ঘোড়ার জেতবার সম্ভাবনা আদৌ নেই, ঘোড়াগুলো দৌড়বার মিনিট কয়েক আগে হঠাৎ তারই ওপর মোটা টাকার বাজী ধরা হয়। সাধারণ লোকে এর উদ্দেশ্যটা মোটেই বুঝতে পারে না। সবাই ভাবে Stable-এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট লোকেরা যখন এই ঘোড়ার ওপর এত টাকার 'বেট্' ধরছে, তখন তার একটা অর্থ আছে নিশ্চয়ই। অর্থ একটা অবশ্যই থাকে, কিন্তু সেটা ঘোড়াটাকে জিতিয়ে দেওয়া নয়।

বুকমেকারদের হিসাব দেখে অনিল আর নরেশ সেদিন আর পাঁচজনের মত ঠিক এই ভুলটাই করল। অনিল প্রত্যেক রেসে একশ' দুশ' টাকা করে 'বেট' করল, কিন্তু বোর্ডে যখন উইনিং ঘোড়ার নাম টাঙিয়ে দেওয়া হল তখন তাদের ঘোড়াগুলের নম্বর কাছাকাছি কোথাও খুঁজে পাওয়া গেল না।

শেষের দিকটায় নরেশ অনিলকে একটু সাবধান করবারও চেষ্টা করেছিল।

—'করছো কি অনিল!'

—'এ ছাড়া উপায় নেই। I win a lot or nothing.'

কিন্তু শেষ কথাটাই খেটে গেল। বন্ধুর দেওয়া হাজার টাকা ছাড়াও অনিল আরও শ'পাঁচেক টাকা সংগ্রহ করে এনেছিল। এই হাজার দেড়েক টাকা ঘোড়ার খুরের ধুলোর সঙ্গে উড়ে গেল।

বাইরে এসে নরেশ বললে, 'কত গেল?'

—'সব।'

—'সব মানে?'

—'মানে everything I had. চল কোন একটা বারের দিকে। I think you won't object.'

নরেশ একটু লজ্জার ভাব দেখিয়ে বললে, 'না না, থাক ; সে বরং আর একদিন।'

—'Don't be silly. চলে এসো। কতদূর নামা যায় দেখা যাক। ম্যাকবেথের কথা মনে পড়ে ?—I'm in blood stepp'd in so far that, should I wade no more, returning were as tedious as go o'er!'

দুজনে এসে একটা ইওরোপীয়ান বারে উঠল। অনিল যে এখানে বেশ সুপরিচিত figure সেটা দ্বারী ও বেয়ারাদের সেলামের ঘটা দেখেই বোঝা গেল।

ওপরে এসে অনিল কক্‌টেলের অর্ডার দিল। ম্যানেজার নিজে এসে করমর্দন করে অনিলকে কুশল প্রশ্ন করে গেলেন। নরেশ একটু হতচকিত ভাবে মুখ বুজে গ্লাসের পর গ্লাস পান করে যেতে লাগল।

রাত ক্রমশঃ বাড়ছিল। জ্যাজব্যাণ্ড শুরু হল। ইওরোপীয়ান পুরুষ ও নারীর ভিড় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। হঠাৎ ওদিককার টেবিল থেকে ডিনার-স্যুট পরা একটি বাঙালী ছেলে উঠে এল অনিলের টেবিলে। অনিলের হাতে প্রচণ্ড ঝাঁকুনী দিয়ে বললে, 'হ্যাল্লো ওল্ড বয়, প্রায় একযুগ পরে তোর সঙ্গে দেখা। আছিস কোথায় ?'

অনিল বললে, 'In Alaska! তারপর তুই ফিরলি কবে ?'

—'দিন দশেক আগে। একদিন তোর বাড়িতেও গিয়েছিলাম, কিন্তু শুনলাম বাড়িতে তোর দেখা পাবার নির্দিষ্ট কোন সময় নেই।'

—'হঠাৎ অভাগার খোঁজ ? কোন খবর ছিল নাকি সিদ্ধার্থ ?'

—'হ্যাঁ, মস্ত খবর। Of course, if you don't mind.'

—'ভয় নেই, অসংকোচে বলতে পার।'

টেবিলের তৃতীয় চেয়ারখানা টেনে বসতে বসতে সিদ্ধার্থ বললে, 'অ্যানের বিয়ে হয়ে গেল নভেম্বরে। আমাকে invite করেছিল, but I missed it.'

অনিল যেন স্বগত আবৃত্তির সুরে বললে, 'অ্যানের বিয়ে হয়ে গেল।'

সিদ্ধার্থ বললে, 'sure!'

—'কার সঙ্গে?'

—'With a Corporal or someone like that of the French Army.'

অনিল একটু চুপ করে থেকে বললে, 'চমৎকার! এই বয়, ম্যানেজারকো সেলাম দেও।'

—'ম্যানেজার কি করবে!'

—'বিশেষ কিছু নয়। অ্যানের বিয়ের খবর পেলাম, আজকের রাতটা আমি celebrate করব। সঙ্গে যথেষ্ট টাকা নেই। I. O. U. লিখে দিলে রাজী হয় কিনা তাই জানতে চাই।'

সিদ্ধার্থ আপত্তি করে বললে, 'এ তুমি বাড়াবাড়ি করছো অনিল, এসব ছেলেমানুষির কোন মানে হয় না।'

নরেশও সায় দিলে, 'সত্যি…'

অনিল প্রায় চীৎকার করে উঠল, 'চুপ করো, চুপ করো। বেঁচে থাকারই কোন মানে হয় নাকি? Let Helen of Troy come down to hell.'

একটু পরেই ম্যানেজার ছুটে এলেন। অনিল উঠে কানে কানে তাঁকে কয়েকটি কথা বললে।

তিনি সম্মতিসূচক ঘাড় নেড়ে বললেন, 'That's O. K. Carry on.'

ম্যানেজার চলে যেতে অনিল টেবিলে ফিরে এল। সিদ্ধার্থের দিকে চেয়ে বললে, 'লাহিড়ী, তুমি একবার সকলকে বলে এসো আমার

হয়ে। Everybody should drink tonight at my cost and drink deep.'

সিদ্ধার্থ বললে, 'কিন্তু খরচ কতো পড়বে তা বোধ হয় আন্দাজ করে উঠতে পারছো না।'

—'বেশ পারছি। এক হাজারের ওপরে উঠবে না। শ্যাম্পেন দিতে হবে সবাইকে। Champagne for those champagne-coloured lips! আমার অনুরোধ লাহিড়ী, তুমি একবার সকলের অনুমতি নিয়ে এসো।'

সিদ্ধার্থ অপ্রসন্ন মুখে উঠে অনিলের প্রস্তাবটা সকলকে জানিয়ে এল। সিদ্ধার্থ ও অনিলেব সঙ্গে অল্পবিস্তর পরিচয় ছিল অনেকেরই, সবাই প্রায় রাজী হয়ে গেল। তাবপর বইল সুরার স্রোত। গ্লাসে গ্লাসে হীরাব মত ঝকমকে শ্যাম্পেন টলমল কবতে লাগল। ওদের মেয়েগুলো পর্যন্ত অপর্যাপ্ত শ্যাম্পেনের সম্ভাবনায় উল্লসিত ও চঞ্চল হয়ে উঠল। অনেকে এসে অনিলকে নিয়ে প্রায় কাড়াকাড়ি শুরু করে দিল। অনিল উঠল না। খানিক চুপ করে থেকে নরেশকে বললে, 'বাড়ি থেকে আমার ভায়োলিনটা আনাতে পার নরেশ, আমি Blue Danube বাজাবো।'

নবেশ বিব্রত হয়ে অনিলেব মুখের দিকে তাকাল। অনিল বললে, 'না, তুমি পারবে না। রাস্তার মাঝখানে ফেলে দিয়ে হয়তো ওটা ভেঙেই ফেলবে! আমি ওটাকে ভয়ানক ভালোবাসি, my first love!'

সিদ্ধার্থ বলল, 'একটু সংযত হও অনিল, এরা কি ভাবছে?'

—'যা খুশি ভাবুক ওরা, I grant them full civil liberty. কিন্তু তুমি এত হিসেবী হলে কবে থেকে লাহিড়ী? লণ্ডনে তুমি তো stand করবার ক্ষমতা নিয়ে বাজী রাখতে।'

—'তা রাখতাম। কিন্তু তুমি আর একটু বাড়াবাড়ি করলে

আমাদের উঠতে হবে। ওদিকে কেউ কেউ হাসতে শুরু করেছে।'

—'ওটা জগতের নিয়ম—আমার account-এ মদ খেয়েছে কিনা। …আচ্ছা লাহিড়ী, তুমি তো ইংরেজী কবিতার মস্ত বড় ভক্ত ছিলে, বল না একটা।'

—'একটু স্থির হয়ে বসবার চেষ্টা করো অনিল।'

—'অর্থাৎ খুন করতে হলে সজ্ঞানে করা চাই, কি বলো? কিন্তু এ আমি পা'র্ব না।' একটু চুপ করে অনিল হঠাৎ আবৃত্তি করতে লাগল:

'I cried for madder music and stronger wine,
But when the feast is over and the lights expire
There comes thy shadow, Cynara and the night is thine.'

সিদ্ধার্থ বললে, 'আমি উঠলাম অনিল, রাত প্রায় একটা হল—'

অনিল বললে, 'আর এক মিনিট, তারপর তোমাদের বিরক্ত করব না।

I am desolate and sick of an old passion,
I am hungry for the lips of my desire,
I am faithful to thee Cynara, in my fashion.'

আর মিনিট কয়েক পরে সিদ্ধার্থ আর নরেশ দুজনে অনিলের দু-হাত ধরে নীচে নিয়ে গেল। সিদ্ধার্থ অনিলকে গাড়িতে তুলে দিয়ে বিদায় নিল, নরেশ গেল সঙ্গে। বাড়ির সামনে এসে নরেশই কি ভেবে ট্যাক্সির ভাড়া মিটিয়ে দিলে, তারপর বললে, 'তোমায় ওপরে পৌঁছে দেব অনিল?'

—'না।'—অনিল বললে, 'এখনো এত মাতাল হইনি যে আর আর একজন মাতালকে নিয়ে বাড়ি ঢুকতে হবে।'

পরদিন সকালে।

অনিলের শোবার ঘর রোদে ভরে গেছে, কিন্তু তখন তার ঘুম ভাঙেনি। খোলা জানালা দিয়ে খানিকটা রোদ এসে পড়েছিল তার ক্লান্ত, প্রায় বীভৎস মুখের ওপর।

বেয়ারা এসে অনিলের ঘুম ভাঙালো। বাইরে কারা যেন তার খোঁজ করছে।

অনিল ধড়মড় করে উঠে বসল। আরক্ত চোখে একবার চারদিকে চেয়ে নিয়ে প্রশ্ন করল, 'কে?'

বেয়ারা উত্তরে বললে, 'কোন হোটেলের লোক-টোক হবে। আগে এসেছিল কয়েকবার।'

মুহূর্তের মধ্যে সব কথা অনিলের মনে পড়ে গেল। সেই ফেনায়িত শ্যাম্পেনের গ্লাসগুলি, লাহিড়ীর মুখে অ্যানের বিবাহ সংবাদ।

অনিল পাথরের মত কিছুক্ষণ বিছানার ওপর বসে রইল।

একটা রাত্রির মধ্যে সমস্ত পৃথিবীতে যেন ভূমিকম্প হয়ে গেছে। আর তারই প্রচণ্ড ধাক্কায় অনিলের ঘর-বাড়ি, সমাজ, সংসার সব যেন ভেঙেচুরে একাকার হয়ে গেছে; সেই বিরাট ধ্বংসস্তূপের মধ্যে বসে আছে একা অনিল। পৃথিবীর সমস্ত অবলম্বন যখন হঠাৎ মানুষের নাগালের বাইরে চলে যায়, তখন মানুষ নিজের মধ্যে নড়ে বসবার ক্ষমতাটুকুও খুঁজে পায় না। এতদিনের এই সংগ্রামের মধ্যে শুধু অনিলের দুটো সান্ত্বনা ছিল, একটা অরুণার কাছে থাকবার দুর্নিবার মোহ, আর একটা হার্টফোর্ডশায়ারের একটি মেয়ের সান্নিধ্যের স্মৃতি। আজ ঘুম থেকে উঠে অনিল দেখল সেই স্মৃতির ভাণ্ডার একেবারে খালি হয়ে গেছে। আজ আর অরুণার সামনে সহজভাবে মুখ তুলে চাইবার উপায় পর্যন্ত তার নেই।

আশ্চর্য punctual এই সাহেব জাতটা!—অনিল মনে মনে ভাবল, ঠিক দশটার সময় গত রাত্রির বিলের টাকা নেবার জন্যে লোক পাঠিয়ে

দিয়েছে। কিন্তু টাকা কোথায়? কাল বিকেলের মধ্যে বন্ধু যতীশ্বরকে এক হাজার টাকা পৌঁছে দেওয়া চাই, তার ওপর হোটেলের এই বিল। ব্যাঙ্ক যে আর টাকা দেবে না সেটা নিশ্চয় করে বলা যায়। অনিল বেয়ারার হাত থেকে বিলটা নিয়ে দেখল। না, এমন কিছু মারাত্মক নয়। এক হাজার চারশ একান্ন টাকা। কিন্তু তাই বা দেওয়া যায় কি করে? উপায় না থাক, সম্ভ্রম বজায় রাখবার চেষ্টা করতে হবে। অনিল বেয়ারাকে চেক বই বার করতে বলল। তারপর আগামী কালের তারিখ দিয়ে পাওনার অঙ্কটা বসিয়ে তাতে সই করে দিল। সই করে অনিল মনে মনে হাসল। চেকের ওপর এইটেই বোধহয় তার শেষ স্বাক্ষর।

বেয়ারা চলে যাবার পর অনিল ঠিক সেই ভাবেই বসে রইল। স্থান, কাল, চলমান পৃথিবী তার কাছে নিরর্থক হয়ে গেছে। লণ্ডন ছাড়বার আগের দিনের কথা তার মনে হতে লাগল। স্টেশনের প্ল্যাটফর্মে নির্লজ্জের মত অনিলের কণ্ঠ বেষ্টন করে অ্যান বলেছিল, 'তোমার জন্যে অপেক্ষা করব। তুমি ফিরে না এলে এ জীবন চিরদিনের মত অন্ধকার হয়ে থাকবে।' আশপাশের সাহেব-মেমগুলো সে দৃশ্য দেখে মনে মনে হাসছিল নিশ্চয়ই। কিন্তু সমস্ত পথ অ্যানের মুখের সেই কথাগুলোই অনিলের মনে মৌমাছির মত গুঞ্জন করছিল। অ্যানের শেষ চিঠির কয়েক-টা ছত্রও অনিলের মনে পড়ে গেল: "How you forgotten your little dove, my dear prince?"

My dear prince! রূপকথার রাজপুত্র! হায়রে হৃদয়!

একলা ঘরের মধ্যে অনিলের ভীষণ হাসি পেতে লাগল। মনে হল, এডমণ্ড ডান্টিসের মত চীৎকার করে বলে, 'Woman, thy name is frailty!' চাকর-বাকরগুলো ভয় পেয়ে যাবে ভেবে চুপ করে গেল। পঁচিশ হাজার টাকার যে ড্রাফট্টা সে এই সেদিন অ্যানের নামে

পাঠিয়েছে, সেটা যেন তার চোখের সামনে ভাসতে লাগল। বিলেতে তার দেনার পরিমাণ হাজার সাতেক টাকার বেশী ছিল না, বাকী টাকাটায় জীনের নতুন বন্ধুর মধুযামিনীগুলো শ্যাম্পেন ও ককটেলের পাত্রে মধুরতর হয়ে উঠবে নিশ্চয়ই! কিন্তু হোটেলের মালিকের নামে এই মাত্র যে চেকটা সে লিখে দিল, সেটা ক্যাস হবে না। সে যেন চোখের সামনে দেখতে পেল, ব্যাঙ্কের কেরানী মৃদু হেসে চেকটা হোটেলের লোককে ফেরত দিচ্ছে। চেকখানার সঙ্গে এঁটে দিয়েছে একখানা স্লিপ—'Amounts not covered'. কথাগুলোর পাশে ছোট্ট একটা ক্রশ দেওয়া। কাল সন্ধের পর টাকা পৌঁছে না দিলে বন্ধু যতীশ্বরও পরের দিন সকালে একবার তাগাদায় আসবে। ব্যবসায়ী লোক, বিনা মুনাফায় বেশী দিন টাকাটা আটক থাকলে তার চলবে না।

সমস্ত দৃশ্যগুলো তাল পাকিয়ে যেন অনিলের চোখের সামনে নাচতে লাগল। সে আর বসে থাকতে পারল না, বিছানা ছেড়ে উঠে পড়ল। অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে বেড়াতে একসময় ড্রেসিং টেবিলের সামনে এসে দাঁড়াল। তার মুখের চেহারাটা কী কুৎসিত হয়ে উঠেছে। একটা রাত্রির মধ্যেই তার বয়স যেন দশ বছর বেড়ে গেছে। চোখের কোণে কালি গভীরভাবে পড়েছে।

দু-হাতে মুখ ঢেকে অনিল ড্রেসিং টেবিলের সামনের চেয়ারটায় বসে পড়ল। ঘড়ির কাঁটায় মুহূর্তের পর মুহূর্ত পার হয়ে গেল, অনিল মাথা তুলল না। আর চারদিকে শুধু অন্ধকার, হিংস্র নিষ্ঠুর কুৎসিত অন্ধকার। মনে হল, এতদিন সে বিচিত্র বর্ণচ্ছটায় উজ্জ্বল মঞ্চের উপর দাঁড়িয়ে মনের খুশীতে বিঠোফেন-মোজার্ট-প্যাডের উইস্কিকে নিয়ে খেলা করছিল, আর অসংখ্য লোকের হাততালিতে প্রেক্ষাগার হয়ে ছিল মুখর; হঠাৎ আলো নিভে গেল, শ্রোতারা প্রেক্ষাগার ছেড়ে গেল সবাই। সিলিংয়ের শেষ আলোটা পর্যন্ত নিভে গেল,

আর সেই জনশূন্য বিরাট অন্ধকারের মধ্যে কেবল তাকে ফেলে রেখে গেল।

মিনিট পনের কুড়ি পরে অনিল সোজা হয়ে উঠে বসল। তারপর চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা-জানালাগুলো একে একে বন্ধ করে দিল। অন্ধকার। তার মনের অন্ধকারের সঙ্গে বাহিরের এই অন্ধকারের কী চমৎকার মিল। সেই অন্ধকারের মধ্যে অনিল আলমারি খুলে চামড়ার ছোট একটা বাক্স বার করল। ড্রেসিং টেবিলের আয়না থেকে বিচ্ছুরিত স্বল্প আলোর সামনে দাঁড়িয়ে অনিল বাক্সটা খুলে ফেলল। বাক্স থেকে ছোট একটা পিস্তল বার হল। অনিল সেটা টেবিলের ওপর রেখে সোজা হয়ে দাঁড়াল। ভীষণ একটা সংকল্প তার দৃঢ়নিবদ্ধ চিবুকে ও ললাটের রেখায় রেখায় পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে। এই অন্ধকারকে সে তার দুই চোখের সামনে স্থায়ী অবিনশ্বর করে যাবে। এই অন্ধকার কেটে আলো আর কোন দিন জ্বলবে না।...

একমুহূর্ত দাঁড়িয়ে থেকে সে টেবিল থেকে পিস্তলটা তুলে নিতে গেল।

হাত পড়ে গেল খামের মত একটা জিনিসের ওপর। একটা নয়, দুটো। পিস্তলটা সেই খাম দুটোর ওপরেই পড়ে ছিল, অনিল লক্ষ্য করেনি। একটু আশ্চর্য হয়ে সে খাম দুখানা চোখের কাছে তুলে ধরল। কিছু ভাল বোঝা গেল না। অনিল ঘরের ইলেকৃট্রিক আলো জ্বেলে দিল। পিস্তলটা পড়ে রইল টেবিলের ওপর। একটা চিঠি অরুণার, আর একটি ব্যাঙ্কের। ব্যাঙ্কের সেক্রেটারী জরুরী চিঠি দিয়ে জানিয়ে দিয়েছেন, তার Overdraft account সুদে-আসলে প্রায় এক হবার উপক্রম হয়েছে। মাসখানেকের মধ্যে সে যদি সুদের টাকাটাও না মিটিয়ে দেয় তাহলে ব্যাঙ্ককে বাধ্য হয়ে আইনের আশ্রয় নিতে হবে। অন্য সময়ে অনিল হয়তো এ চিঠি পড়ে বিব্রত হয়ে

পড়ত। আজ কিন্তু সে আরেকটু চঞ্চল হয়ে পড়ল, এই মাত্র। বাড়িটা যে যাবে সেটা সে অনেক আগেই ধরে রেখেছে। যাক, যত তাড়াতাড়ি পথের ধুলায় জনতার মাঝখানে নেমে দাঁড়ান যায়, ততই ভাল। তখন আর সমাজ থাকবে না, সভ্যতা থাকবে না, ভদ্রতা রাখবার মিথ্যে চক্ষুলজ্জা থাকবে না।

কিন্তু অরুণা হঠাৎ চিঠি লিখল কি মনে করে?

অনিল দ্বিতীয় চিঠিখানা খুলে পড়তে লাগল।

অনিল,

এখানে এসে পর্যন্ত তোমায় পাঁচখানা চিঠি দিয়েছি, কিন্তু তুমি তার উত্তর পর্যন্ত দাওনি। প্রায় মাস তিনেক হল আমি এখানে এসেচি, এব মধ্যে তুমি কি একখানা চিঠিও লেখবার সময় পর্যন্ত করে উঠতে পারলে না? কি ভাবচে বলতো সবাই। তোমার শরীর ভাল আছে তো? আমি তোমার কথা ভেবে সমস্ত রাত ভালো করে ঘুমুতেও পারি না। আর তুমি? তোমার একবার মনেও পড়ে না। অথচ, তোমাকে কত বড় একটা সুখবর দেবার ছিল···চিঠিতে আমি লিখতে পারলাম না। এখানে এলে সব কথা জানতে পারবে।

এই রবিবার আমার জন্মদিন। সেদিন এরা ছোটখাট একটা উৎসবের আয়োজন করেছে। সবাই আশা করছেন, সেদিন তুমি আসবেই। কিন্তু আমি জানি, তোমার সময় হবে না। যদি সত্যিই তোমার সময় না হয়, তাহলে আমার হয়তো আত্মহত্যা করা ছাড়া উপায় থাকবে না।······

অনিল চিঠির শেষ পর্যন্ত পৌছতে পারল না। আত্মহত্যা কথাটার ওপর চোখ পড়তেই সে যেন চমকে উঠল। আত্মহত্যা! অরুণা যেন তার মনের কথার প্রতিধ্বনি করেছে। ধরা পড়ে গিয়েছে অনিল। টেবিল থেকে পিস্তলটা তুলে নিয়ে সেটাকে অনিল আলনায়

টাঙানো কোটের পকেটে ফেলে দিল। তারপর আলোটা নিভিয়ে তাড়াতাড়ি ঘরের দরজা জানালাগুলো খুলে ফেলল। এই সকাল বেলাতেই ঘামে তার সর্বাঙ্গ ভিজে গেছে। বাইরের বাতাস ঘরে ঢুকতে সে যেন নিশ্বাস ফেলে বাঁচল।

অনিল আরও কিছুক্ষণ ঘরের মধ্যে চুপ করে বসে রইল। বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ একটা উপায় তার মনকে সচকিত করে তুলল। জলে ডুবে যাবার আগে মানুষ যেমন সামনে যা কিছু দেখতে পায় সেইটাকেই হাত বাড়িয়ে জড়িয়ে ধরতে চায়, অনিলের তেমনই হঠাৎ মনে হল, বেগমপুরে গিয়ে পৌঁছলে আপাততঃ তার সকল সমস্যার সমাধান হতে পারে। অরুণার কাছে সে যদি প্রার্থীর মত গিয়ে দাঁড়ায়, তা হলে হাজার তিন-চার টাকা যোগাড় করে দেওয়া তার পক্ষে নিশ্চয়ই কঠিন হবে না।

ঘর থেকে বেরিয়ে অনিল উত্তেজিত ভাবে চাকর-বাকরগুলোকে ডাকাডাকি শুরু করে দিল। চিঠির কথা কেন তারা আগে বলেনি, সে জন্য তাদের খানিকটা ধমক দিল। তারপর টাইমটেবল দেখে আধঘণ্টার মধ্যেই বেরিয়ে পড়ল স্টেশনের উদ্দেশে। কোনরকমে মুখটা ধুয়ে, আনলায় টাঙান কোটটা কাঁধের ওপর ফেলে, এক পেয়ালা চা এবং কিছু রুটি ডিম খেয়ে সে বেরিয়ে পড়ল। ট্রেন এগারটায়। সেটা ধরতে না পারলে, বিকেলের মধ্যে বেগমপুরে পৌঁছান অসম্ভব।

ট্রেনের কামরায় বসে বসে অনিল বহুদূরবিস্তৃত মাঠ আর তরুশ্রেণীর দিকে চেয়ে যেন স্বপ্ন দেখতে লাগল। এই তার দেশ বাঙলা। খানা-ডোবা, বন-জঙ্গল, ভাঙা কুঁড়ে, স্বল্পবাস পরিহিত নরনারী, উলঙ্গ শিশুর দল, আসন্ন সন্ধ্যার অন্ধকারে চারদিকে কেমন একটা ম্রিয়মাণ ভাব। এই বাঙলাকে সে দ্রুতধাবনের নেশায় ভুলে গিয়েছে একেবারে। তবু এখানে হয়ত সমৃদ্ধির নেশার বদলে স্বস্তির

অমৃত আছে ; সভ্যতার উগ্র উত্তেজনার বদলে আছে নিষ্ক্রিয় আলস্যের অনাস্বাদিত মাধুর্য।

হার্টফোর্ডশায়ারের পল্লীপথ। পাইপ-মুখে সান্ধ্যভ্রমণ, পাশে অ্যান···পঁচিশ হাজার টাকার একটা ড্রাফট্, রেসকোর্সের বিকট জনতার বহুকণ্ঠের কোলাহল, হোটেলের সেই শ্যাম্পেন সুরভিত রাত্রি···সব, সব যেন অনিলের চোখের সামনে দিয়ে ছবির পর ছবির মত ভেসে যেতে লাগল।

স্টেশনে অনিলকে নিয়ে যাবার জন্য জমিদার বাড়ির লোকজন এবং মোটর এসেছিল। অনিল যে আসবে না এটা একরকম জানা থাকলেও অরুণা চুপি চুপি লোকজন পাঠাতে ভোলেনি। শ্বশুরের গাড়িতে চড়ে অনিল যখন রায়বাড়িতে পৌঁছল তখন সন্ধ্যার ছায়া গাঢ়তর হয়ে এসেছে। ঠাকুরবাড়ি থেকে সন্ধ্যারতির আওয়াজ কানে আসে।

দ্বিরাগমনের পর শ্বশুরবাড়িতে অনিলের এই প্রথম পদার্পণ— কিন্তু কি বিচিত্র অবস্থায়! অনিলকে নিমন্ত্রণ করে চিঠি গেছে, সঞ্জীব সে খবরটা রামচরণের মারফতে পেয়েছিলেন। কিন্তু অরুণার জন্মতিথি উৎসবের প্রধান উদ্যোক্তা শুভেন্দু বা বরুণাকে ডেকে এ-সম্বন্ধে কোন কথা জিজ্ঞেস করেননি। অনিলকে নিয়ে মোটর যখন গেট পার হয়ে গাড়িবারান্দার সামনে এসে দাঁড়াল, সঞ্জীব তখন ওপরের ঘরে শুয়ে তামাক টানছিলেন। নীচে মোটরের হর্ন শুনে নিমাইকে জিজ্ঞেস করলেন, ‘দেখ তো নিমাই, সাহেব এলেন বুঝি।’

নিমাই জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে অনিলকে মোটর থেকে নামতে দেখে বললে, ‘হ্যাঁ হুজুর।’

সঞ্জীব এর পরে অবশ্য কোন কথা বললেন না। কিন্তু মনে হল তিনি খুশী হয়েছেন। মুহূর্তের মধ্যে অনিলের আসবার খবরটা যেন বেতারে রায়বাড়ির এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্ত পর্যন্ত ছড়িয়ে গেল।

রায়বাড়ির ইতিহাসে যেন উল্লেখযোগ্য একটা ঘটনা ঘটেছে। দেখতে দেখতে চারদিকে উৎসাহ-উত্তেজনার ঢেউ বয়ে গেল।

অরুণার ঘরে বরুণা ও অরুণা অনিলের জন্য অপেক্ষা করছিল।

অনিল আসতে বরুণা বললে, 'বাপরে বাপ, স্বয়ং মহাদেবের তপস্যা করলেও তিনি এর আগে বর দিতেন। কিন্তু আপনার দয়া আর কিছুতেই হয় না।'

অরুণা মাথায় কাপড় তুলে দিতে দিতে বললে, 'কতো কাজের লোক বলতো। তোর বরের মতো নিষ্কর্মা নাকি।'

অনিল বললে, 'ঠাট্টা করলে আমি বুঝতে পারি না, এমন অপবাদ আমায় কেউ দেয়নি। সত্যি খুব অন্যায় হয়ে গেছে।'

—'তবু ভালো যে দোষটা নিজের মুখে স্বীকার করলেন।'

—'Truce তা হলে। কিন্তু আপনার তিনি কোথায়?'

—'দিদির জন্মতিথি উৎসবের আয়োজন করছেন।'

—'I see, তিনি তাহলে যজ্ঞেশ্বর।'

—'আপনি থাকতে।'

হাসবার চেষ্টা করে অনিল বললে, 'আমি আর থাকতে পেলাম কই।'

বরুণা বললে, 'শহর ছেড়ে আপনার এই পাড়াগাঁয়ে ভালো লাগবে কেন? নইলে কোন্‌দিন ছুটে আসতে হত।···কিন্তু আর বিরক্ত করব না আপনাকে। আপনি দিদির সঙ্গে কথা কন। আমি—'

—'যজ্ঞেশ্বরের সন্ধানে?'

—'সন্ধানে নয়, সাহায্যে'—বলে অরুণা হাসতে হাসতে চলে গেল।

অনিল বরুণার সঙ্গে হেসে কথাবার্তা কইলেও মনের দুশ্চিন্তাটাই তার মুখের ওপর ফুটে উঠেছিল। বরুণা চলে যেতেই সে সিগারেটকেস খুলে সিগারেট ধরাল।

অরুণা মধুর হেসে, একটু অভিমান মিশ্রিত স্বরে প্রশ্ন করল, 'হঠাৎ দয়া হল যে ?'

—'নইলে নির্দয় বলে অখ্যাতি রটবার সম্ভাবনা ছিল যে !'

—'শুধু সেই ভয়ে ?'

—'ঠিক তা নয়, নিজেরও একটু গরজ ছিল।'

—'গরজ ? তোমার !'

অনিল বলবার চেষ্টা করল, কিন্তু পাবল না, সংকোচে বেধে গেল। বলল, 'সত্যিই তাই। কিন্তু সেটা পরে শুনো। আগে তোমার সুখবরটাই শুনি—যা চিঠিতে লিখতে পারোনি ?'

—'চিঠিতে যা বলতে পারিনি, সামনা-সামনি সেটা বলতে পাববো—এই বুঝি তোমার…'

—'এ-সব ব্যাপারে বুদ্ধি আমার সত্যিই কম। কিন্তু যে ভাবেই হোক চিঠিতে যখন উল্লেখ করেছ, তখন ওটা জানা দরকার।'

অরুণার মত শিক্ষিতা মেয়ের মুখও যেন লজ্জায় রাঙা হয়ে উঠল। বললে, 'আহা, নিজে যেন সত্যিই কিছু বুঝতে পারেননি !'

অপরূপ ভঙ্গী করে সে ঘর থেকে চলে যাবার উপক্রম করল। অনিলের মুখের চিন্তার ছায়াটা হঠাৎ যেন একটু গাঢ় হয়ে উঠল। তবে কি…?

কিন্তু এখন সে কথা ভাবলে চলবে না। আগামী কালটাই তার জীবনের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। সকলের আগে তারই সমাধান হওয়া প্রয়োজন। তারপর সে পৃথিবীকে নতুন করে দেখতে শিখবে ; সুস্থ ও সহজ মানুষ হবার চেষ্টা করবে আর একবার। মনের ভাবটাকে দমন করে অনিল বললে, 'I see, I see, কিন্তু তুমি হঠাৎ চললে কেন, আমার কয়েকটা কথা বলার ছিল।'

অরুণা ফিরে দাঁড়াল।

কিন্তু মনে মনে যে কথাটা বলা আজ এক সময়ে অত্যন্ত সহজ মনে হয়েছিল, অরুণার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে সেইটাই এখন কত না দুঃসাধ্য মনে হতে লাগল। অথচ সময় অল্প, আজ রাতের মধ্যে একটা ব্যবস্থা না করতে পারলে কাল বেলা দশটার পর তার সমস্ত মর্যাদা ও সম্ভ্রম কলকাতার ফুটপাথের ধুলায় লুটাতে থাকবে। একটু ইতস্তত: করে অনিল বললে, 'কথাটা শুনলে তুমি হয়তো রাগ করবে অরুণা…'

কথাটা যে কতদূর কঠিন হতে পারে অরুণার পক্ষে সেটা কল্পনা করা প্রায় অসম্ভব। সে হাসতে হাসতে বললে, 'রাগ করব না, করব না, করব না। হলো তো? এবার বলো?'

অনিল একমিনিটের মধ্যে নিজের মনটাকে যেন তৈরি করে নিল। বলল, 'হঠাৎ কিছু টাকার দরকার হয়েছিল। এখনও কোন কিনারা হয়নি। ভাবছিলাম তুমি যদি তোমার বাবাকে… অবশ্য…'

অরুণা এবার চিন্তিত কণ্ঠে বললে, 'কতো টাকা?'

—'Say, হাজার তিনেক। অবশ্য এটা ধার হিসেবেই…'

—'কিন্তু…'

—'আমার অন্য উপায় থাকলে আমি তোমায় বিব্রত করতাম না অরুণা, বিশেষতঃ আজকের দিনে। কিন্তু আমি সত্যিই বিপন্ন। You should see to it.'

—'বাবা আজ পর্যন্ত আমার সঙ্গে ভালো করে কথা বলেননি, তাঁর কাছে আমি মুখ ফুটে এ কথা বলতে পারবো না।—আমি শুভেন্দুকে বলে দেখবো।'

—'Who's he? তিনি কে?'

—'বরুণার স্বামী, আমাদের বন্ধু, গাইড। তার সঙ্গে পরামর্শ না করে বাবাকে কোন কথা বলার সাহস আমাদের নেই।'

—'I see, তিনিই তোমার বাবার conscience keeper! কিন্তু টাকাটা আমার কাল ভোরেই দরকার। বেলা দশটার মধ্যে সেটা ব্যাঙ্কে জমা দিতে হবে। আমি ফাস্ট ট্রেনে কলকাতায় ফিরতে চাই।'

অরুণার মুখ দুশ্চিন্তায় অন্ধকার হয়ে উঠল। বললে, 'সে তো প্রায় অসম্ভব।...তবু শুভেন্দুকে আমি বলে দেখবো, সে যদি সাহস করে বাবাকে বলতে পারে।'

—'তিনি এ-কথা জানতে পারেন এ আমি চাই না।'

—'কিন্তু এ ছাড়া উপায় কি?'

—'এ-বাড়ির সবাই কি সেই মেয়ে-ঘেঁষা ছেলেটির কথায় ওঠা-বসা করে থাকে?'

তাদের বিয়ের ব্যাপারে শুভেন্দু কত বেশী সাহায্য করেছিল অরুণা তা জানত। কাজেই শুভেন্দু সম্বন্ধে এই অশোভন মন্তব্যটা সে ঠিক পরিপাক করতে পারল না। একটু দৃপ্ত ও গর্বিত কণ্ঠে বললে, 'একরকম তাই বইকি। উনি এখানে যাওয়া-আসা করেন, আমাদের সুখ-দুঃখের খোঁজ খবরও রাখেন। তোমার মত শুধু দরকারের খাতিরে...'

অনিল একবার তীক্ষ্ণ সংশয়-কুটিল চোখে অরুণার মুখের দিকে চাইল। তারপর উত্তেজিত কণ্ঠে বললে, 'এসব কথা আমার শুনতে ভাল লাগছে না অরুণা। যদি পার, চেষ্টা করে দেখ। নইলে আজ রাতেই আমি কলকাতায় ফিরবো।'

—'একটু অপেক্ষা করো। আমি দেখছি, যদি কোন ব্যবস্থা করা সম্ভব হয়।'

অরুণা চলে গেল। অনিল অস্থিরভাবে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল। সকালে স্নান হয়নি, ভাল করে খাওয়া হয়নি সারাদিন। তারপর অরুণার মুখে এই সব নিরুৎসাহজনক কথা।

সমস্ত মিলে যেন তার মাথার মধ্যে আগুন জ্বালিয়ে দিল। জানালা দিয়ে হুহু করে হাওয়া আসছিল। আকাশ জ্যোৎস্নায় ভাসছে। কিন্তু অনিলের কাছে আকাশের সমস্ত জ্যোৎস্না যেন কবে মরে গিয়েছে। হাওয়া পাবার জন্যে সে জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল; দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ পকেটে হাত দিয়ে দেখল, সেই পিস্তলটা। অনিল চমকে উঠল। তাড়াতাড়িতে ওটা রেখে আসা হয়নি। বিব্রত হয়ে পিস্তলটা অনিল আবার পকেটের মধ্যে রেখে দিল। মনে মনে বললেঃ যাক, ভালোই হয়েছে! ফিরতি ট্রেনের কামরায় এই পিস্তলটাই হয়ত তার বন্ধুর কাজ করবে।

অনিলের আগমন এবং অরুণার জন্মতিথি উপলক্ষ্য করে শুভেন্দু আর বরুণা সামান্য একটু কৌতুকের আয়োজন করে রেখেছিল।

রায়বাড়ির একপাশে বিস্তীর্ণ ফুলবাগান, মোটর গ্যারেজ, আস্তাবল, ইলেক্‌ট্রিক ডায়নামোর স্বতন্ত্র ঘর। অপর পাশে আম জাম লিচুর বাগান; তারই মধ্যে দিয়ে এঁকেবেঁকে প্রকাণ্ড একটা ঝিল অনেকদূর পর্যন্ত চলে গেছে। বাড়ির মেয়েদের সুবিধার জন্য ঝিল কাটা হয়েছিল একেবারে অন্দর-মহলের গা ঘেঁষে। বরুণা আর শুভেন্দু কৌতুকের আয়োজন করেছিল এই ঝিলেরই ধারে। অন্দর-মহলের নীচের তলার বারান্দায় শুভেন্দু তারই আয়োজন নিয়ে ভীষণ ব্যস্ত ছিল। একরাশ ফুলের গহনা রুপোর থালা চন্দনের বাটি প্রভৃতি সে গুছিয়ে রাখাব চেষ্টা করছিল।

বরুণাকে তার সঙ্গে কথা কইতে দেখা গেল।

—'কি এমন রাজকার্যে ব্যস্ত রয়েছ, দু-মিনিট স্থির হয়ে কথা শোনবারও সময় নেই নাকি?'

—'মডার্ন শকুন্তলা অভিনয় হবে, এরি মধ্যে ভুলে গেলে নাকি ? এখুনি আমাকে গিয়ে নায়িকার রূপসজ্জার ব্যবস্থা করতে হবে। সময় মোটেই নেই—'

—'নায়িকা কিন্তু অন্য কাজে ব্যস্ত। তাঁর হয়েই তোমাকে একটা কথা জানাতে এসেছিলাম।'

—'বলে ফেল চটপট।'

—'তোমাকে একটা উপকাব কবতে হবে, আমাব আর দিদির অনুরোধ।'

—'তোমাব একলাব অনুবোধেই হবে আর দিদির যোগ কবার দরকাব নেই।···তা ব্যাপাবটা বেশ ঘোবালো কবে আরম্ভ করেছ দেখছি। বলে ফেল দিকি।'

—'হাজার তিনেক টাকা যোগাড় করে দিতে হবে, আজ রাত্রে—'

—'আজই রাত্রে ? হঠাৎ ?'

—'অনিলবাবু কাল সকালেই চলে যাবেন—টাকাটা তাঁব বিশেষ দবকাব।'

—'এসেই বুঝি সেই কথাটা জানিয়েছেন ? অদ্ভুত লোক যা হোক!'

—'খুব জরুরী দবকার না হলে কেউ এমনভাবে টাকা চাইতে পাবে ?'

—'বেশ তো। অরুণাদি বাবাকে বলে টাকাটা অনায়াসে যোগাড কবে দিতে পারেন। টাকা তো তোমাদেরই।'

—'অনিলবাবু দ্বিরাগমনের পব এই প্রথম এলেন। তিনি আসতে না আসতে দিদির পক্ষে তাঁর নাম করে টাকা চাওয়া কি সম্ভব ? তা ছাড়া বিয়ের পর থেকে বাবা দিদির ওপর কি রকম চটে আছেন জানো তো।'

—'তা হলে দিদির জবানিতে তুমিই তো টাকাটা চাইতে পারো। শ্বশুরমশাই তোমার কথায় ওঠেন বসেন।'

—'অনিলবাবুর নাম করে চাইলে টাকা তিনি দেবেন না; বাবার আসল রাগ তো তাঁরই ওপর।'

—'হবে। কিন্তু অন্য উপায়ও তো নেই।'

—'কিন্তু…তুমি যদি এই টাকাটা তোমার দরকার বলে তাঁর কাছে চেয়ে নাও…'

ভবশঙ্করের রক্ত শুভেন্দুর মাথায় হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল। বললে, 'তুমি কি বলছো বরুণা। নিজের দরকার বলে আমি টাকা চাইতে যাবো তোমার বাবার কাছে?'

—'তুমি চাইলে বাবা 'না' বলবেন না। তোমাকে তিনি আমাদের চেয়ে অনেক বেশী ভালোবাসেন।'

—'সেটা তাঁর উদারতা, কিন্তু আমি নিজেকে অতখানি খাটো করতে পারবো না।'

—'একজন বিপদে পড়েছে, তাকে সাহায্য করার জন্যেও নয়?'

—'না। চিরকাল আমি হাসি-তামাসা করেই কাটিয়ে এলাম সত্যি! কিন্তু জীবনে আমিও একটা principle মেনে চলি। বাবার ইচ্ছের বিরুদ্ধে আমি দু'মাস ছ'মাস এখানে এসে পড়ে থাকতে পারি; কিন্তু সেটা সুবিধা আদায়ের জন্যে নয়। তোমাকে ভালোবাসি বলে, তোমার কাছাকাছি থাকতে চাই বলে। তুমি আমাকে মাপ করো বরুণা।'

বরুণা কিছুক্ষণ ম্লানমুখে দাঁড়িয়ে থেকে বললে, 'অনিলবাবুর দরকার খুব বেশী না হলে আমি তোমায় অনুরোধ করতাম না।'

শুভেন্দু বললে, 'আমি জানি বরুণা, মনের দিক থেকে তুমি কতো বড়। কিন্তু আমার উপায় নেই। অনিলবাবু যদি একটা দিন অপেক্ষা করেন তা হলে আমি বরং কাল বাড়ি গিয়ে একটা ব্যবস্থা করতে পারি। আজ রাতে সেটাও সম্ভব নয়।'

—'অনিলবাবু কাল সকালেই চলে যেতে চান।'

—'অর্থাৎ তিনি টাকাটা সংগ্রহ করবার জন্যেই এসেছিলেন। কিন্তু কি করব বলো, তাঁর দুর্ভাগ্য! যাক ও-কথা। তুমি অরুণাদিকে একটু তাড়াতাড়ি পাঠিয়ে দিও। নইলে সব আয়োজন মাটি হবে। বাবা হয়তো এখুনি জামাইদের নিয়ে খেতে বসার জন্য হাঁক পাড়বেন।'

রঙ্গ-কৌতুকের বাসনা তখন বরুণার মিটে গেছে। সে ক্লান্ত, নিরুৎসাহ পায়ে ওপরে উঠে এল।

ওপরের ঘরে অনিল উৎকণ্ঠিতভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছিল। একহাতে শ্বেতপাথরের থালায় কিছু ফল আর মিষ্টান্ন এবং অন্য হাতে রুপোর গ্লাসে জল নিয়ে অরুণা ঘরে ঢুকল। থালা আর গ্লাস টিপয়ের ওপর রেখে অরুণা বললে, 'বাথরুমে যাবে?'

অনিল বললে, 'না।'

—'তাহলে একটু জল খাও। আজ বাবা জামাইদের নিয়ে খেতে বসবেন, হয়ত রাত হবে।'

—'তা হোক, ক্ষতি নেই। কিন্তু আমি যে-কথাটা বলেছিলাম...'

অরুণা একমিনিট চুপ করে থেকে বললে, 'শুভেন্দু বাবাকে বলতে রাজী হল না।'

—'কেন? ভবিষ্যতে তার অংশ থেকে যদি হাজার তিনেক টাকা কম পড়ে, এই ভয়ে!'

—'ছিঃ! শুভেন্দুকে অত ছোট করে দেখো না।'

—'তবে আপত্তি কিসের?'

—'ওঁর principle-এ বাধে।'

—'Principle! লোককে বিপদ থেকে উদ্ধার করা—তাও নিজের টাকা ধার দিয়ে নয়, এও কি principle নাকি! Funny! তুমি হাসালে অরুণা!'

—'সত্যিই তাঁর principle-এ বাধে অনিল। তিনি বলেছেন, তুমি একটা দিন অপেক্ষা করলে তিনি নিজে টাকাটা কাল যোগাড় করে দেবেন। কিন্তু বাবাকে বলা তাঁর পক্ষে অসম্ভব।'

—'আমি তাঁর কাছে সাহায্য প্রত্যাশা করে আসিনি অরুণা। ও কথা বলে তিনি শুধু আমার অপমানের মাত্রাটা বাড়াতে চান।'

—'তোমার অপমান করবার জন্যে তিনি ও কথা বলেননি।'

—'না, তিনি ঘৃণা, বিদ্বেষ, অহংকাব—এ সব কিছুর উর্ধ্বে, একেবারে demi-god! যাক, তুমি তার মনের খবরও রাখো জেনে খুশী হলাম। আমার বলবার আব কিছু নেই অরুণা, নিজের পথ বেছে নেবার উপায় আমার নিজের কাছেই আছে।'

পকেটে হাত দিয়ে সে পিস্তলটা সন্তর্পণে অনুভব করে নিল।

অরুণা উদ্বিগ্নকণ্ঠে বললে, 'তুমি বড় উত্তেজিত হয়ে এসেছো অনিল। স্নান কবে, সুস্থ হয়ে সব কথা একবাব ভালো করে ভেবে দেখবার চেষ্টা কবো। তাবপব যদি মনে কবো, আমাব সমস্ত গহনা আমাব কাছেই আছে, সেগুলো বিক্রি করে অথবা বন্ধক বেখে অনায়াসে বন্দোবস্ত হতে পাবে।'

অনিল মুহূর্তের জন্যে ভাববার চেষ্টা করল। কিন্তু সেটা একেবারেই অসম্ভব। সে সবকিছুই কল্পনা কবতে পাবে, কিন্তু বাড়ির পাঁচজনকে লুকিয়ে স্ত্রীর গায়ের গহনা খুলে নিয়ে বন্ধক দিতে বা বিক্রি করতে পারে না। তার মধ্যে ভদ্রতা যেটুকু অবশিষ্ট আছে, সেটুকুও সে খুইয়ে ফেলতে নারাজ। তা ছাড়া কথাটা সঞ্জীব এবং শুভেন্দু, কারও একদিন জানতে বাকী থাকবে না, কারণ কবে যে সেগুলো ফিরে আসবে তার কোন স্থিরতাই নেই। তখন এ-বাড়ির পাঁচজনের সামনে স্বামীসৌভাগ্য-গর্বিতা অরুণাই বা মুখ দেখাবে কি করে?

অনিল জুতোটা খুলে ফেলে অরুণাব বিছানার ওপর যেন ভেঙে পড়ল। এতক্ষণ যেন আলোর একটু ক্ষীণ রেখা দেখা যাচ্ছিল, কিন্তু

এখন আবার চারপাশ থেকে ক্রুর, কুৎসিত অন্ধকার তার সমস্ত সত্তাকে গ্রাস করে ফেলছে। মনে মনে সে একবার এই ভেবে হাসবার চেষ্টা করল যে, এত প্রচণ্ড প্রয়োজনের সামনেও তার মনের মধ্যে আত্মাভিমান আর ভদ্রতার অহংকার ঠিক আগের মতই বেঁচে আছে। নইলে অরুণার কথায় কেন সে রাজী হতে পারল না; কেন জোর করে বলতে পারল না, 'দাও, তোমার গয়নাগুলোই এনে দাও।...'

পকেটের পিস্তলটা গায়ে বিঁধছিল; অনিল হঠাৎ উঠে বসে বললে, 'সে আমি পাবব না অরুণা। কলকাতায় ফেরবার ট্রেন ক'টায় বলতে পারো?'

—'আটটায়। কিন্তু এভাবে তুমি যেতে পারবে?'

—'কেন?'

—'বাবার কাছে, আর পাঁচজনের কাছে আমি কি বলবো? গয়নাগুলো নিয়ে যাওয়াব চেয়েও কি সেটা বিশ্রী দেখাবে না?'

—'তাই বলে শুভেন্দু যখন মনে মনে হাসবে তখন আমাকে তার পাশে বসে এ-বাড়ির পোলাও-পরমান্ন খেতে হবে?'

অরুণা একবার ভাল করে অনিলেব মুখের দিকে চাইল। তার দুই চোখের কোলে মুক্তোর মত বড় বড় দু-ফোঁটা জল টলমল করছে, এখনই ফেটে পড়বে বুঝি!

সে বললে, 'তোমাকে কাছে পাবার জন্যে আমি বাবার স্নেহ পর্যন্ত হারিয়েছি, আমার জন্যে তুমি এতটুকুও পারবে না অনিল?'

অনিলের মনের অর্ধমৃত আর্টিস্ট সেই অভিমান-অবরুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে যেন ক্ষণকালের জন্যে বেঁচে উঠল। অলসভাবে বিছানার ওপর শুয়ে পড়তে পড়তে অনিল বললে, 'তুমি যাও অরুণা, আমি থাকবো।'

কিন্তু মানুষের মধ্যে ভাল ও মন্দের পরস্পরবিরোধী যে দুটি শক্তি প্রতিনিয়ত পরস্পরের সঙ্গে সংগ্রাম করে চলেছে তাদের মধ্যে একটির আর একটির কাছে হেরে যেতে সময় লাগে কতক্ষণ? বোধ

হয়, কয়েক মিনিটের বেশী নয়। তাই অরুণা চলে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই যেন বিগত দিনরাত্রিগুলির প্রেতচ্ছায়া ভয়াবহ রূপ পরিগ্রহ করে অনিলের চোখের সামনে উন্মাদ-নৃত্য শুরু করে দিল। মনে হতে লাগল, এই অনাবিল জ্যোৎস্নারাত্রি ও সুকোমল শুভ্রশয্যার মাঝখানে এবং একটি প্রতীক্ষমান হৃদয়ের কাছে তার আর স্থান নেই। এখনি পালাতে না পারলে কয়েক মিনিটের মধ্যেই সে দমবন্ধ হয়ে মারা যাবে। রিস্টওয়াচটার দিকে চেয়ে দেখল, আটটা বাজতে তখন মিনিট পঁচিশেক বাকী। আর দেরি করা চলে না। অনিল উঠে পড়ে মাথার এলোমেলো চুলগুলো হাত দিয়ে ঠিক করে নিল। ফেরবার টিকিট তার সঙ্গেই আছে। রাত্রিতে সেকেণ্ড ক্লাস কম্পার্টমেণ্টে ভিড় একেবারে থাকে না। এই নিরাশ্বাস জীবন-নাট্যের ওপর শেষব :রর মত যবনিকা টেনে দেবার সেই তো উপযুক্ত অবসর! কেউ জানবে না, হয়তো কেউ খোঁজও পাবে না। কেবল হাওড়া স্টেশনে ঝাড়ুদার গাড়ি পরিষ্কার করতে এসে হঠাৎ একটা মৃতদেহ দেখে একেবারে চমকে উঠবে···!

কোটের বোতামগুলো এঁটে অনিল যাবার জন্যে প্রস্তুত হল।

হঠাৎ বরুণা ঘরে ঢুকে বললে, 'আসুন জামাইবাবু।'

অনিল কোন রকমে নিজেকে সামলে নিয়ে বললে, 'কোথায়? এরই মধ্যে খাবার ডাক পড়লো নাকি?'

—'না। খাবার এখনো অনেক দেরি। আমার নিজের একটা দরকার আছে আপনার সঙ্গে। একবার ঝিলের দিকে যেতে হবে আপনাকে।'

—'ঝিলের ি-কে? কেন বলুন তো?'

—'সব কথা আগে থাকতে নাই বা শুনলেন?'

অনিল কি বলবে ঠিক করতে না পেরে বরুণার অনুসরণ করল।

অনিল আসবার পর সঞ্জীব অনেকক্ষণ আশা করে বসেছিলেন, সে অন্ততঃ একবার তাঁর সঙ্গে দেখা করবে। এতদিনের অনুপস্থিতির জন্যে তখন যে ক'টা বাছা বাছা কথা তাকে শুনিয়ে দেওয়া হবে তারও একটা খসড়া তিনি মনে মনে করে রেখেছিলেন। কিন্তু অনিলের আসবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না। না আসুক জমিদার বাড়িতে জামাইয়ের যে সম্মানটুকু ন্যায্য প্রাপ্য, তা থেকে তিনি অনিলকে বঞ্চিত করতে চান না। তাই অনেকক্ষণ গড়গড়ার নল মুখে দিয়ে বসে থাকবার পর একসময় তিনি উঠে বসলেন। রামচরণকে ডেকে বাড়ির সবচেয়ে বড় আর সুসজ্জিত ঘরখানা খুলে দিতে বললেন এবং বরুণাকে ডেকে জানিয়ে দিলেন যে দুই জামাই, দুই মেয়ে এবং তিনি আজ রাত্রিতে একসঙ্গে খেতে বসবেন।

এ বাড়িতে এককালে ছেলে-বউ, কর্তা-গিন্নী, মেয়ে-জামাই সবাই একসঙ্গে খেতে বসত এবং আহার-পর্বের এই স্বল্প সময়টুকুর মধ্যে প্রীতির একটা অনাস্বাদিত সম্বন্ধ গড়ে উঠত। ক্রমশঃ সেই ব্যবস্থাটা লোপ পেতে বসেছিল। সেদিন সঞ্জীব সেই রীতিটাকে পুনঃপ্রচলনের সুযোগ পেয়ে মনে মনে বেশ খুশী হয়ে উঠেছিলেন। বরুণার ওপর হুকুম জারি করে তিনি বড় জামাইয়ের শোবার ঘরের বিধিব্যবস্থার তদারক করতে উঠে গেলেন। বাড়ির চাকর-বাকরগুলো কোনদিনই মনিবের মতিগতির আদি-অন্ত খুঁজে পায় না; সেদিনও তারা ঘন ঘন পরস্পরের মুখের প্রতি তাকিয়ে সন্ত্রস্তভাবে বাড়িব কর্তার আদেশ পালন করতে লাগল।

অরুণার জন্মতিথি উপলক্ষ করে শুভেন্দু আর বরুণা যে সামান্য কৌতুকের আয়োজন করেছিল সেটা এবার একটু স্পষ্ট করে বলা প্রয়োজন। ব্যাপারটা আর কিছুই নয়। অরুণা পর্যাপ্ত পুষ্পসম্ভারে সেজে আশ্রম-লালিতা শকুন্তলার মত ঘুরে বেড়াবে আর সেই সময়

বরুণা গিয়ে ডেকে আনবে অনিলকে। অনিল এই দৃশ্য দেখে আনন্দিত হবে নিশ্চয়ই। তারপর বরুণা এক সময় দু'জনের সান্নিধ্য লাভের সুযোগ দিয়ে চলে আসবে বাড়ির ভেতর। শুভেন্দু থাকবে নিকটের এক লতাকুঞ্জে; হঠাৎ একসময় আত্মপ্রকাশ করে সে তাদের বিস্মিত এবং বিব্রত করে তুলবে। কিন্তু বাড়ির ভেতরের ব্যাপারটা অনিল যে রকম ক্রমশঃ জটিল করে তুলেছিল তাতে অরুণা এবং বরুণার দুজনেরই সমান নিরুৎসাহ হয়ে পড়ার কথা। হয়েছিলও তাই। অরুণা তো কিছুতেই রাজী হতে চায়নি। শুভেন্দুকে ব্যাপারটা স্থগিত রাখবার জন্য বারবার অনুরোধ করেছিল। কিন্তু শুভেন্দুকে কিছুতেই নিরস্ত করা গেল না।

সে বললে, 'সংসারে দুঃখ আছে, দুশ্চিন্তা আছে, সবই জানি। সেগুলো চিরকাল থাকবে। কিন্তু তাই বলে সেগুলোকেই মানুষ সবচেয়ে বড বলে মেনে নেবে? অনিলবাবু এখন যেটাকে অপরিহার্য বলে মনে করছেন, আজকে রাত্রিতে সুস্থ হয়ে ঘুমোবার পর সেটা হয়ত ততখানি জরুরী বলে তাঁব মনে হবে না এবং কালকের মধ্যে তার একটা ব্যবস্থা কববই। আজ শনিবার, বাবা বাড়িতে এসেছেন; কাল বিকেলে তিনি কলকাতায় ফিরে যাবেন। নইলে আজ রাত্রিতেই আমি বাড়ি গিয়ে সমস্ত ব্যবস্থা করে আসতাম।'

অরুণা তবু চিন্তিত মুখে দাঁড়িয়ে রইল।

শুভেন্দু বললে, 'আমি কলকাতা থেকে সখ করে একরাশ ফুলের গয়না আনিয়েছি, সেগুলো অনর্থক মাটি হতে দিতে রাজী নই। উঠুন, নইলে হয়তো আমায় বলপ্রয়োগ করতে হবে।'

অগত্যা অরুণাকে উঠতেই হল।

সকলে মিলে ঝিলের ধারে লতাকুঞ্জের কাছে এল। মাথার ওপর নিষ্কলঙ্ক নীলার মত পরিষ্কার আকাশ। ঝিলের জলে চাঁদের ছায়া পড়েছে। বরুণা একে একে ফুলের গয়নাগুলি শুভেন্দুর নির্দেশ-

অনুসারে দিদিকে পরিয়ে দিল, চন্দন পরিয়ে দিল কপালে, তারপর অনিলকে ডাকবার জন্য ভেতরে চলে গেল।

অন্দরমহলের ওপরে গিয়ে ফিরে আসতে বেশ কিছুক্ষণ সময় লাগবার কথা। একে মনের মধ্যে বিষম অস্বস্তি, তার ওপর একরাশ ফুলের গয়না পরে দাঁড়িয়ে থাকা। অরুণা অস্থির হয়ে উঠল। বললে, 'আমি আর এমন করে সঙ সেজে দাঁড়িয়ে থাকতে পারছি না শুভেন্দুবাবু। কী উদ্ভট খেয়াল আপনার!'

শুভেন্দু বললে, 'খেয়াল মাত্রই উদ্ভট অরুণাদি। আমি আপনার কোন কথাই শুনবো না। আপনি হয়েছেন শকুন্তলা, অবশ্য আধুনিকা, আর কোটপ্যাণ্টপরা মিস্টার দুষ্মন্ত এলেন বলে। তিনি এলে আমি কি গান গাইব জানেন তো?' সুর করে শুভেন্দু বললে, 'চাঁদ হাস হাস, হারা হৃদয় বুঝি ফিরে এসেছে!'

অরুণা বললে, 'হৃদয় তো হারায়নি শুভেন্দুবাবু, যথাস্থানেই আছে। তা ছাড়া এটা বড় সেকেলে হল।'

শুভেন্দু আশ্চর্য হবার ভঙ্গী করে বললে, 'রবীন্দ্রনাথ সেকেলে! আপনি কি বলছেন অরুণাদি? কিন্তু বাজে কথায় ভুললে চলবে না, আপনি কোন্ গানটা গাইবেন সেটা মনে আছে তো? সেই যে—
'বিরহ মধুর হলো আজি এ-মধুরাতে!'

অরুণা ছেলেমানুষের মত হেসে উঠে বললে, 'বাবাঃ, এত সবও আসে আপনার মাথায়! কিন্তু ও আমি পারবো না।'

অরুণা সবেগে মাথা নাড়তেই ফুলের সিঁথিখানা খুলে পড়ার উপক্রম হল। শুভেন্দু ছুটে অরুণার কাছে গিয়ে বললে, 'কি করছেন অরুণাদি? ড্রপ ওঠবার সময় হল, এখন আর বিভ্রাট বাধিয়ে বসবেন না।'

একটু দূরে অনিল আর বরুণাকে আসতে দেখা গেল। শুভেন্দু ব্যাকুলকণ্ঠে বললে, 'ওই যাঃ মিস্টার দুষ্মন্ত এসে পড়লেন বলে। সরে

আসুন, আপনার মাথার সিঁথিটা ঠিক করে দিই। তারপর আবার আমাকে সরে পড়তে হবে। আসুন, এগিয়ে আসুন—।'

অরুণাকে জড়সড় হয়ে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে শুভেন্দু নিজেই আর একটু সরে গিয়ে ফুলের সিঁথিটা ঠিক করে দিতে লাগল। কিন্তু সেটা যথাস্থানে পরিয়ে দেবার আগেই অনিল আর বরুণা একেবারে কাছাকাছি এসে পড়ল। অনিলের মুখখানা রীতিমত কঠিন ও ভ্রূকুটি-কুটিল হয়ে উঠেছে।

বরুণা সেটা লক্ষ্য না করে হাসতে হাসতে অরুণার দিকে চেয়ে বললে, 'এই নাও তোমার দুষ্মন্ত—' বলে অনিলের একটা হাত নিয়ে সে অরুণার হাতের ওপর রাখতে গেল। কিন্তু আর্টিস্ট অনিলের মনের মধ্যে সংশয়-সন্দিগ্ধ আদিম একটি মানুষ ততক্ষণে একেবারে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে। সে হাত সরিয়ে নিয়ে বললে, 'কী সব ছেলেমানুষি করছেন আপনারা, আমি এগুলো ঠিক পরিপাক করতে পারছি না।'

শুভেন্দু হাসতে হাসতে বললে, 'এইসব ছোটখাটো অভদ্রতাগুলো আজ আপনাকে সহ্য করতেই হবে অনিলবাবু, আমরা ছাড়ছি না।'

অনিল বললে, 'না, ছাড়বেন কেন! আপনি হলেন বাড়ির মেয়েদের friend, philosopher and guide. ওর সঙ্গে আমি আর একটা কথা যোগ করে দিতে চাই—দুইটি হৃদয়ের একচ্ছত্র সম্রাট্!'

অনিলের কথাগুলোকে নিছক পরিহাস মনে করে শুভেন্দু হোহো করে হেসে উঠল। তারপর বললে, 'আপনি চমৎকার কথা বলতে পারেন অনিলবাবু। কিন্তু আজ সত্যিই রাগ করলে চলবে না। জীবনটা ভারি একঘেয়ে, তার মধ্যে একটু বৈচিত্র্যের স্বাদ থাকা দরকার।'

অনিল বললে, 'সে বৈচিত্র্য তো আপনি পূর্ণমাত্রাতেই উপভোগ করছেন দেখতে পাচ্ছি। From the arms of one to the lips of the other.'

তার কণ্ঠস্বরে পরিহাস তরলতার কোন চিহ্নই পাওয়া গেল না। অরুণা শঙ্কা-সন্ত্রস্ত দৃষ্টিতে অনিলের মুখের দিকে চেয়ে রইল। শুভেন্দু পর্যন্ত আশ্চর্য হয়ে গেল। একটু বিব্রত কণ্ঠে সে বললে, 'আপনাদের বিলিতি ঠাট্টার রস আমরা ঠিক উপলব্ধি করতে পারবো না অনিলবাবু, কিন্তু এটা বোধ হয় ভদ্রতার সীমা অতিক্রম করলো।'

অনিল বললে, 'কার্যক্ষেত্রে সে-সীমা আপনি অনেক আগেই অতিক্রম করেছেন।'

অরুণার মুখের ওপর কে যেন এক ঘা বেত বসিয়ে দিলে। আহত অবরুদ্ধ কণ্ঠে সে বললে, 'তুমি একথা ভাবতে পারলে অনিল!'

অনিল বললে, 'চব্বিশ ঘণ্টা আগে হয়তো পারতাম না, এখন পারি।'

শুভেন্দু এতটা সহ্য করতে পারল না, বললে, 'আপনি আমাকে যা খুশী বলুন, কিন্তু অরুণাদির মিথ্যা অপমান আমি সহ্য করব না অনিলবাবু।'

—'কি করবেন আপনি?'

—'আমার দুর্ভাগ্য অনিলবাবু, আমি ছোটলোক হয়ে জন্মাইনি; নইলে গলাধাক্কা দিয়ে আপনাকে এ বাড়ির বার করে দিতেও আমার বাধতো না।'

—'এ বাড়ির বিষাক্ত আবহাওয়া ছেড়ে দূরে সরে যেতে পারলে আমিও বড় কম খুশী হতাম না মিস্টার চৌধুরী। দুঃখের বিষয় এর একটা প্রতিকার না করে যেতে পারছি না। আমি জানি, পারিবারিক সম্বন্ধের সুযোগ নিয়ে এ দেশের অনেক পুরুষ অন্তঃপুরের শুচিতা অনায়াসে নষ্ট করে। আপনিও তাদেরই দলে। শুনেছি আপনার অনেক টাকা, আপনি মস্তবড় নীতিবিদ। জীবনে principle-টাই আপনার কাছে সবচেয়ে বড়। পরস্ত্রীর সঙ্গে নিভৃতে প্রণয়গুঞ্জন, সেটাও বোধহয় আপনার নীতির গণ্ডীর মধ্যেই পড়ে?'

অরুণা আবার তেমনই ব্যাকুল কণ্ঠে বললে, 'সব কথা না শুনে তুমি পাগলের মতো কি বলছো অনিল?'

অনিল হোহো করে হেসে উঠল, 'পাগল হলে বেঁচে যেতাম অরুণা, এতবড় কুৎসিত দৃশ্যটা আমাকে চোখে দেখতে হত না।'

শুভেন্দু বলল, 'আপনার মন যে এত ছোট, তা কোনদিন ভাবিনি অনিলবাবু। এটা আমার নিজের বাড়ি নয়, নইলে আপনাকে উপযুক্ত শিক্ষা আজই দিতাম।'

সমস্ত ব্যাপারটা বরুণা যেন এতক্ষণে উপলব্ধি করতে পেরেছে। সে সন্ত্রস্তভাবে শুভেন্দুর হাত ধরে ফেলে বললে, 'তোমারও কি মাথা খারাপ হয়ে গেল নাকি! কাব সঙ্গে তর্ক কবছ তুমি? চলো, ভিতরে চলো।'

শুভেন্দু কঠিন কণ্ঠে বললে, 'আমি যাবো না বরুণা, উনি কতদূর এগোতে চান আমি দেখতে চাই। তাবপর কি কবতে হবে সেটা আমার ভাল করেই জানা আছে। Scoundrel!'

অনিল ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললে, 'You say that?'

শুভেন্দু যেন মবিয়া হয়ে উঠল, বললে, 'একশোবাব। এমন ইতরের মন নিয়ে সভ্যসমাজেব গণ্ডীর বাইরে থাকাই উচিত ছিল আপনার। আপনাব দুর্ভাগ্য, আমি নিজের বাড়িতে দাঁড়িয়ে আপনাব সঙ্গে আলাপ করবার সুযোগ পেলাম না; নইলে আমার পাইক-পেয়াদাগুলো আপনাকে সারাজীবনের শিক্ষা একদিনে দিয়ে দিতে পারতো।'

কয়েকটা কঠিন কথা অনিলের মুখেও এসেছিল, হঠাৎ তার হাত পড়ে গেল পকেটে। মুহূর্তের মধ্যে সত্যই সে সমস্ত ভদ্রতা ও রীতি-নীতির গণ্ডীর বাইরে চলে গেল। পকেট থেকে পিস্তলটা বার করে অনিল বললে, 'সেই ভাল। জীবনে আপনারও কিছু শিক্ষার দরকার ছিল। সেটাও আজকেই হয়ে যাক।'

অরুণা আর বরুণা দুজনেই সামনে গিয়ে শুভেন্দুকে ঘিরে দাঁড়াল। কিন্তু শুভেন্দুর শরীরে চৌধুরীবংশের রক্ত, সে পিস্তল দেখে নারীর পেছনে লুকোবে কেন? জোর করে দুই হাতে অরুণা আর বরুণাকে সরিয়ে দিয়ে সে অনিলের সামনে এসে দাঁড়াল। বললে, 'পিস্তল উঁচু করে আমাকে ভয় দেখাবেন না, অনিলবাবু। ওগুলো নিয়ে ছেলেবেলায় আমিও যথেষ্ট খেলা করেছি।'

বোমা ফাটার শব্দের মত অনিলের তীব্র তিক্ত কণ্ঠস্বর শোনা গেল, 'কিন্তু আমি এটা ঠিক খেলা করছি না, মিস্টার চৌধুরী। আপনার বাড়ির অনুপস্থিত পাইক-পেয়াদার চেয়ে এটার ক্ষমতা ঢেব বেশী। Prepare for the worst! বাইরে আমি অনেক সহ্য করেছি। কিন্তু ঘরের ভেতর পচা পাপ আমি জমা হতে দেব না।'

কিন্তু চরমক্ষণের জন্যে শুভেন্দুর প্রস্তুত হবার প্রয়োজন হল না। মুহূর্তেব মধ্যে পিস্তলের একটা গুলি বেরিয়ে শুভেন্দুর বুকে বিঁধল আব তার শব্দে জ্যোৎস্নারাত্রির প্রশান্তি যেন বিদীর্ণ খণ্ডবিখণ্ড হয়ে গেল। শুভেন্দু বুকে হাত দিয়ে মাটির ওপর বসে পড়ল, আর অরুণা ও বরুণার আর্তনাদে চারিদিক যেন কেঁপে উঠল। তারা দুজনে ছুটে গেল শুভেন্দুর কাছে। আর অনিল? দুঃস্বপ্ন ও জাগরণের মাঝে প্রেতগ্রস্ত মানুষের মত স্থির হয়ে সে সেইখানেই দাঁড়িয়ে বইল। প্রবলতম উত্তেজনার মুহূর্তে পিস্তলের ঘোড়াটা কখন যে টিপে দিয়েছিল নিজেই সে যেন তা ভাল করে বুঝতে পারছিল না।

অন্দরমহলের ওপরতলায় সবচেয়ে বড় ঘরে সঞ্জীব বড় জামাইয়ের জন্যে বিছানা পাতবার ব্যবস্থা নিজে তদারক করছিলেন। খাটের ওপর রেশমী চাদর বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে, চাকরগুলো কয়েকটা বড় বড় তাকিয়া এনে রেখেছে খাটের ওপর। খাটের শিয়রে টিপয়ের ওপর রুপোর প্রকাণ্ড একটা থালা এনে রাখা হয়েছে, তাতে

সন্ত-ফোটা একরাশ গোলাপ। সঞ্জীব ঘরে ঢুকে তদারক করছিলেন এবং 'এটা এখানে রাখ' 'ওটা ওখানে রাখ' করে হুকুম দিচ্ছিলেন। নিমাই ছুটতে ছুটতে তাঁর সামনে এসে আতঙ্ক-বিস্ফারিত চোখে বললে, 'কত্তা……', কিন্তু কথা শেষ করতে পারলে না।

সঞ্জীব আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'কি খবর রে নিমাই, অমন করে চাইছিস কেন?'

নিমাই একবার হাউমাউ করে, চীৎকার ও কান্নায় মিশিয়ে যা বললে, তা থেকে সঞ্জীব এইটুকু বুঝতে পারলেন যে শুভেন্দুকে বড় জামাইবাবু গুলি করেছে।

সঞ্জীব বজ্রাহতের মত সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে থেকে বললেন, 'বড় জামাইবাবু গুলি করেছে শুভেন্দুকে?'

নিমাই উত্তর না দিয়ে ঠকঠক করে কাঁপতে লাগল।

—'কথা কচ্ছিস না কেন? শুভেন্দু বেঁচে নেই?'

-'কথার সময় নেই হুজুব, সব বোধ হয় এতক্ষণ—'

সঞ্জীব এক মিনিট চুপ করে থেকে বললেন, 'সব শেষ হয়ে গেছে? কী বলছিস উল্লুক? আমাব বন্দুকটা আন, বন্দুক—'

নিমাই আশ্চর্য হয়ে সঞ্জীবেব মুখেব দিকে চাইল। তিনি উত্তেজনায় কাঁপছিলেন। প্রায় চীৎকার কবে বললেন, 'হাঁ করে কি দেখছিস হারামজাদা! নিয়ে আয় আমার বন্দুক!'

নিমাই তখনও হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছে দেখে তিনি নিজেই ছুটতে ছুটতে নিজের ঘরে গিয়ে স্ট্যাণ্ডে ঝুলানো বন্দুকটা নিয়ে ঝিলের দিকে অগ্রসর হলেন। তাঁর গজদন্ত নির্মিত খড়মের শব্দে বাড়ির ভেতরটা মুখর হয়ে উঠল। অনেকদিন পর রায়বাড়িতে উৎসবের যে ক্ষীণ আভাস পাওয়া যাচ্ছিল হঠাৎ বিশ্রীভাবে সেটা ভিন্নপথে চলে গেল। চাকরবাকরগুলো স্তম্ভিতের মত দাঁড়িয়ে সঞ্জীবের সেই উন্মাদ অভিযান লক্ষ্য করতে লাগল, বাধা দেবার সাহস কারই বা হবে!

সঞ্জীব যখন ঝিলের ধারে এসে পৌঁছলেন তখন সেখানে রীতিমত ভিড় জমে গেছে। রায়বাড়ির নায়েব-গোমস্তা সবাই সেখানে এসে জড় হয়েছে, ভেতর ও বাইরের ব্যবধান আর নেই। কয়েকজন মিলে রক্তাক্ত শুভেন্দুকে ধরাধরি করে ভেতরে নিয়ে যাচ্ছিল, সঞ্জীব সেদিকে দৃক্‌পাত না করে বললেন, 'কই, কোথায় সেই বদমায়েস, পাজি খুনেটা! কই সে?'

অনিল কাছেই একটা উঁচু ঢিপির ওপর ত্নহাতে মুখ ঢেকে বসে ছিল। সঞ্জীব বন্দুক হাতে করে তার দিকে এগিয়ে গেলেন।

সেদিকে চোখ পড়তেই বরুণা যেন আর্তনাদ করে উঠল, 'বন্দুক নিয়ে এসেছো কেন বাবা? বন্দুক কি হবে?'

সঞ্জীব বললেন, 'কি হবে তা এখুনি বুঝিয়ে দিচ্ছি মা।'

অনিলের একটা হাত ধরে টানতে টানতে তিনি বললেন, 'উঠে দাঁড়াও! রাস্কেল! আমি তোমায় ক্ষমা করব না। আমার রক্তে ক্ষমা নেই। বুক পেতে সোজা হয়ে দাঁড়াও—'

অরুণা একবার সঞ্জীবের মুখের দিকে চাইবার চেষ্টা করলে, কিন্তু পারলে না। অনিল উঠে দাঁড়াল। রামচরণ হঠাৎ সঞ্জীবের পা চেপে ধরে বললে, 'দিনকাল পালটে গেছে কর্তা, খুন করলে পুলিস আপনাকেও রেহাই দেবে না, ও-কাজ করবেন না কর্তা।'

সঞ্জীব সজোরে পা ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন, 'এ-বাড়িতে অনেক বদমায়েস বজ্জাতকে এ-বন্দুকের গুলিতে মরতে হয়েছে রামচরণ। কোন ভয় নেই, ছেড়ে দে আমায়।'

বরুণা এবার সঞ্জীবের সামনে গিয়ে দাঁড়ল। তাঁর চোখের ওপর চোখ রেখে বললে, 'আপনি পাগল হয়ে গেছেন বাবা! আপনার ত্নই মেয়ের সিঁথির সিঁত্নর একসঙ্গে না ঘুচলে কি আপনি সুখী হবেন না?'

সঞ্জীব একবার অরুণার মুখের দিকে চাইলেন। অরুণা তাঁর

দিকে তাকাতে পারল না। কিন্তু সঞ্জীব বন্দুকটা নামিয়ে রামচরণের হাতে দিলেন এবং তার পরেই লোকজনের দিকে চেয়ে বললেন, 'তোরা সব সঙের মতো দাঁড়িয়ে কি দেখছিস? শুভেন্দুকে ওপরে নিয়ে যা। এখনো হয়তো বাঁচতে পারে। ডাক্তার ডাকতে লোক পাঠানো হয়েছে?'

রামচরণ বললে, 'মোটর নিয়ে বর্ধমানে লোক চলে গেছে, তা ছাড়া এখানকার গোবিন্দ ডাক্তার এলেন বলে।'

—'চৌধুরীবাড়িতে খবর গেছে?'

কথাটা রামচরণের মনে হয়েছিল, কিন্তু সে সাহস করেনি। কিন্তু কি বলবে ঠিক করতে না পেবে সে চুপ করে রইল। সঞ্জীব আবার বললেন, 'চৌধুরীদের ওখানে লোক পাঠাও রামচরণ, হাঁ করে দাঁড়িয়ে থেকো না। কিংবা তুমি নিজেই গাড়ি নিয়ে চলে যাও। বেয়াই-মশাইকে সঙ্গে করে নিয়ে আসা চাই।'

রামচরণ চৌধুরীবাড়ি যাবার জন্য অগ্রসর হচ্ছিল। সঞ্জীব হঠাৎ জিজ্ঞেস করলেন, 'পুলিসে খবর দেওয়া হয়েছে?'

রামচরণ নিরুত্তর।

সঞ্জীব বললেন, 'দয়াধর্ম তোমার শরীরে ইদানীং একটু বেশী হয়েছে দেখছি রামচরণ। এখনো পুলিসে খবর দেওয়া হয়নি, দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে সবাই যাত্রা দেখছো? চৌধুরাবাড়ি যাবার সময় থানায় দারোগাকে খবর দিয়ে যেও। নইলে ওরা এ-বাড়িতে ঢোকবার সাহস পাবে না।'

ভবশঙ্কর চৌধুরী সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে ওপরে ওঠবার উপক্রম করছিলেন। রামচরণ তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললে, 'আপনাকে একবার ও-বাড়ি যেতে হবে বে'ইমশাই। ছোট জামাইবাবু·········'

ভবশঙ্কর, 'কি হয়েছে?'

রামচরণ বললে, 'বড়জামাইবাবুর সঙ্গে ঝগড়া-ঝগড়ির মাথায় বুকে গুলি বিঁধেছে—দয়া করে চলুন একটি বার।'

ভবশঙ্কর দাঁড়িয়েছিলেন, কাছাকাছি একটা চেয়ারের ওপর বসে পড়লেন। এটা যে একটা মস্তবড় ষড়যন্ত্রের ব্যাপার, সে-বিষয়ে তাঁর বিন্দুমাত্র সন্দেহ রইল না। এক মিনিট স্তব্ধ হয়ে বসে থাকবার পর তিনি বললেন, 'তাই খবর দিতে ছুটে এসেছো? লজ্জা করলো না রামচরণ এ-বাড়ির চৌকাঠ ডিঙোতে? ছেলেটাকে জোর করে আটকে রেখে, প্রাণে মেরে ফেলে তবে তোমরা নিশ্চিত হলে!'

রামচরণ বললে, 'এখনো হয়তো বাঁচতে পারেন। বর্ধমান থেকে বড় ডাক্তার আনতে লোক গেছে। বড় জামাইবাবুকে গ্রেপ্তার করবার জন্যে কর্তা নিজে পুলিসে খবর পাঠিয়েছেন।'

ভবশঙ্কর অস্থিরভাবে চেয়ার থেকে উঠে বললেন, 'বুকে গুলি বিঁধেছে, বড় ডাক্তার এসে কি করবে রামচরণ? ছেলের বউটাকে এখনো তো ভালো করে চোখে দেখলাম না, একসঙ্গে দুদিন তাকে নিয়ে ঘর করতেও পেলাম না। ছিল ছেলেটা, তাও পাঁচজন চক্রান্ত করে খতম করে দিলে। কিন্তু এটা জেনে রেখো রামচরণ, আমি সহজে ছাড়বো না। রায়মশাই-ই হোক আর তাঁর জামাই-ই হোক, খুনী যাতে ফাঁসিকাঠে ঝোলে তার ব্যবস্থা আমি করবো।'

রামচরণ নিরুত্তর নতমুখে দাঁড়িয়ে রইল।

ভবশঙ্কর তাঁর খাস চাকরকে হাঁক পেড়ে বললেন, 'বিষ্টু, আমার গাড়ি তৈরী করতে বল।'

রামচরণ মাথা নীচু করে বললে, 'গাড়ি আমার সঙ্গেই ছিল বেই-মশাই—'

ভবশঙ্কর বললেন, 'সে গাড়িতে তুমি একা যাবে—।'

চৌধুরীবাড়ি যাবার পথে রামচরণ থানায় খবর দিয়ে গেছল।

মিনিট পনেরোর মধ্যেই দারোগা জন দুই কনস্টেবল নিয়ে রায়বাড়িতে পৌঁছলেন। সঞ্জীব যেন তাঁদের জন্যেই অপেক্ষা করছিলেন।

সব কথা শুনে দারোগাবাবু বললেন, 'আপনি কথা দিলে আমি নিজের ঝুঁকিতে আসামীকে জামিনে খালাস রাখতে পারি। নইলে এসব কেসে জামিন হয় না রায়মশাই।'

সঞ্জীব বললেন, 'জামাইকে জামিনে খালাস রাখবার জন্যে আমি আপনাদের ডাকিনি। আপনারা আপনাদের কাজ করুন।'

দারোগাবাবু মনে মনে একটা দাঁও কল্পনা করে এসেছিলেন। সঞ্জীবের কথায় তিনি ক্ষুণ্ণ হলেন। নিরুৎসাহ কণ্ঠে বললেন, 'একটা গাড়ি তৈরি করতে বলে দিন তাহলে—হাঁটিয়ে এতটা পথ—'

সঞ্জীব বললেন, 'আমার গাড়ি-ঘোড়াগুলো খুনী আসামীদের নিয়ে থানায় যাবার জন্যে তৈরী হয়নি দারোগাবাবু! তুমি তাঁকে হাঁটিয়েই নিয়ে যাবে।'

সঞ্জীব ওপরে উঠবার জন্য তক্তাপোষ থেকে উঠে দাঁড়ালেন। পুলিস তাদের কর্তব্য পালন করবার জন্য প্রস্তুত হল।

চৌধুরীবাড়ি থেকে ভবশঙ্কর এসে পড়লেন। শুভেন্দুর বিবাহের পর দুই বেয়াইয়ের এই প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু কেউ কারুর সঙ্গে কথা বললেন না। রামচরণের সঙ্গে সোজা ওপরে উঠে গেলেন।

সঞ্জীবের ঘরে প্রশস্ত খাটের ওপর শুভেন্দু শুয়ে আছে। ভবশঙ্কর ঘরে ঢুকতেই বরুণা মাথায় ঘোমটা তুলে দিল। ভবশঙ্কর কারও প্রতি লক্ষ্য না করে ছেলের শিয়রে গিয়ে বসলেন। শুভেন্দু চোখ বুজে পড়ে ছিল। ডাক্তার গোবিন্দবাবু প্রাথমিক একটা ব্যবস্থা করে দিয়েছেন—শুভেন্দু কোন রকমে নিশ্বাস ফেলতে পারছিল। ভবশঙ্কর তার হাতের ওপর ধীরে ধীরে একটা হাত রাখতেই শুভেন্দু চোখ মেলে চাইল। কেউ কোন কথা বলল না এবং সেই অখণ্ড নীরবতার মধ্যেই যেন বাপ ও ছেলের দীর্ঘ বিরোধের অভূতপূর্ব মীমাংসা হয়ে গেল।

বর্ধমান থেকে বড় ডাক্তারও এসে পড়লেন, সঙ্গে দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট, নানারকম যন্ত্রপাতি, কিছুই বাদ পড়ল না। বুকের গ্লালটাকে চিরে ফুঁড়ে বার করবার জন্যে যথাসাধ্য চেষ্টাও তাঁরা করলেন।

কিন্তু আয়ুর প্রদীপ যার নিভে এসেছে, ডাক্তারী শাস্ত্র তাকে বাঁচাবে কোন্ মন্ত্রে? শেষরাত্রের দিকে শুভেন্দুর অবস্থা বাঁকা পথ ধরল, সঙ্গে সঙ্গে শ্বাসকষ্ট। ডাক্তারের মুখেও উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট হল।

রাত তখন প্রায় চারটে। অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। শুভেন্দু হাত নেড়ে অরুণাকে কাছে আসবার ইঙ্গিত করলে। ভবশঙ্কর উঠে দাঁড়ালেন। শুভেন্দু ক্ষীণ হাসবার চেষ্টা করে, অতিকষ্টে বলতে পারলে, 'দুঃখ আছে, আর চিরকাল থাকবেও অরুণাদি। কিন্তু সেটাকেই বড় হতে দেবেন না। বরুণার ভার আপনাকেই নিতে হবে।'

হাত বাড়িয়ে শুভেন্দু যেন কাকে খুঁজতে লাগল। পাশেই বিছানার ওপর মাথা রেখে বরুণা যেন ভেঙে পড়েছিল। তার বিস্রস্ত চুলগুলোর ওপর হাত পড়তেই শুভেন্দু যেন প্রাণপণ শক্তিতে উঠে বসবার চেষ্টা কবল। ডাক্তার শঙ্কিত হয়ে বিছানার কাছে ছুটে এলেন। কয়েকজন মিলে তাকে ধীরে ধীরে বিছানার ওপর শুইয়ে দিল। শুভেন্দুর মুখের দিকে চেয়ে ডাক্তার হঠাৎ তার একটা হাত একটু তুলে ধরলেন; তারপর পাল্‌স্ দেখে বললেন, 'It is all over Mr. Chowdhury.'

বরুণা আর অরুণার আর্তকণ্ঠের কান্না ঘর থেকে বার হয়ে সমস্ত বাড়িখানাকে যেন আচ্ছন্ন করে ফেলতে লাগল।

ভবশঙ্কর আসবার পর সঞ্জীব এঘরে ঢোকেননি। পাশের ঘরে জেগে বসেছিলেন। কান্নার রোল ওঠবার পরেও তিনি সেই ভাবেই বসে রইলেন।

সবচেয়ে অদ্ভুত অবস্থায় পড়ল অরুণা। তার ছোট বোন সিঁথির সিঁদুর মুছে, থান কাপড় পরে রইল একই বাড়ির চতুঃসীমানার মধ্যে, সহানুভূতি আর সমবেদনার উৎস সবাই উজাড় করে ফেলল তারই দুঃখ-দুর্ভাগ্যের কথা স্মরণ করে, অরুণার দিকে দৃষ্টি দেবার অবসর কারও হল না এবং তার প্রয়োজনও কেউ বোধ কবল না। লোকের সামনে নিজের জন্যে দুফোঁটা চোখের জল ফেলবার পর্যন্ত উপায় অরুণার রইল না। খবরের কাগজে হত্যাকাণ্ডের সত্য ও মিথ্যায় মিশ্রিত যে সব বিবরণ বার হল, সেগুলি পাঠ করে আত্মীয়-স্বজন চিঠি লিখতে ভুলল না। শিলং থেকে অনিলের কাকীমা এবং কলকাতা থেকে কৃষ্ণা অনিলের এই অদ্ভুত আচরণের জন্য স্তম্ভিত হয়েই কর্তব্য সমাপন করলেন। বরুণাব সঙ্গে আরও একজনের ভবিষ্যৎ যে চিরকালের মত গভীর অন্ধকারে ডুবে গেল, সে কথা কেউ উল্লেখও করল না। না করুক, অরুণা নিজের মনকে ধীরে ধীরে প্রস্তুত করে ফেলল। বেগমপুর থেকে পালিয়ে যেতে পারলেই সে বোধহয় বাঁচত, কিন্তু উপায় নেই বলে সে এখানে থেকেই সমস্ত প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি দাঁড়াবার জন্যে প্রস্তুত হল।

অনিলকে পুলিসে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যাবার পর এ-বাড়ির একটা গোমস্তা পর্যন্তও তার খবর নিতে যায়নি। মাস তিনেক পরে কেবল খবরের কাগজের মারফত এইটুকু শোনা গিয়েছিল যে অনিল আত্মপক্ষ সমর্থনের জন্যে কোন কথাই বলতে রাজী হয়নি, নিজে কোন জবানবন্দী পর্যন্ত দেয়নি। ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে ভবশঙ্করই তোড়জোড় করে সাক্ষীসাবুদ খাড়া করেছিলেন এবং তার ফলে এ-বাড়ির কয়েকজন কর্মচারী পর্যন্ত ভগবানের নাম করে গোটাকতক মিথ্যা কথা বলে এসেছে। সঞ্জীব তাতে কোন আপত্তি করেননি। ম্যাজিস্ট্রেট আসামীকে দায়রা সোপর্দ করে তাঁর কর্তব্য পালন করেছেন এবং

হত্যাকাণ্ডের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে খবরের কাগজের 'নিজস্ব সংবাদদাতারা' যে সব বিবরণ প্রেরণ করেছে তাতে উত্তেজনাপ্রিয় পাঠকসমাজের কিছুকালের মত আলোচনার খোরাক জুটবে নিশ্চয়।

'নিজস্ব সংবাদদাতারা' প্রায় সবাই-ই ভবশঙ্কর চৌধুরীর মনের কথার প্রতিধ্বনি করেছেন, সঞ্জীবের ছোটজামাই যাতে রায়বংশের বিপুল ঐশ্বর্যের ওপর কোনরকম ভাগ বসাতে না পারে, বড়জামাইয়ের একাধিপত্যের পথ যাতে নিরঙ্কুশ হয়, শুভেন্দুকে খুন করার উদ্দেশ্য যে তাই, তা সকলে প্রায় নিঃসংশয়ে জেনে ফেলেছে। অরুণা শহর থেকে কাগজ আনিয়ে চুপি চুপি এ-সব খবর সংগ্রহ করেছে; কিন্তু কারও কাছে মুখ ফুটে কোন কথা বলার উপায় তার নেই।

বলবেই বা কাকে ?

আকস্মিক দুর্ঘটনার প্রতিক্রিয়া বরুণার সমস্ত মনটাকে যেন বজ্রাহত বস্তুর মত অসাড় করে ফেলেছে। তার মুখের দিকে চাইতেই পারা রীতিমত কষ্টকর। খুব শক্ত মেয়ে বরুণা, তাই এরই মধ্যে ঠিক আগেকার মত সংসারের সব ভার সে আবার নিজের কাঁধের ওপর তুলে নিয়েছে, আর কেউ হলে হয়ত একেবারে ভেঙে পড়ত।

সঞ্জীবের অবস্থা তো ঘটনার পরদিন থেকে অর্ধ-উন্মাদের মত। শুভেন্দু সঞ্জীবের ঘরে মারা গিয়েছিল বলে সে-ঘরে ঢোকা পর্যন্ত তিনি ছেড়ে দিয়েছেন। রামচরণকে নিয়ে দিনরাত তিনি বসে থাকেন পাশের ঘরটিতে। বাইরের লোকজনের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ একেবারে বন্ধ। মাঝে মাঝে আপন মনেই যেন বলতে থাকেন, 'একে একে সবাই যাবে রামচরণ, বুড়ো যখের মতো এই কাঠগুলোকে আগলে বেঁচে থাকবো শুধু আমি!'

রামচরণ কোন কথা না বলে চুপ করে থাকে।

সঞ্জীব আবার বলেন, 'জীবনে অত্যাচার তো কম করিনি, রামচরণ!

রাখাল মাইতির ছেলে আর জামাইটাকে তুমিই না জেলে পাঠিয়েছিলে ?'

রামচরণ এবার সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করে, 'জমিদারি রাখতে হলে অমন কাজ সবাই করে থাকে হুজুর। ও নিয়ে ভাবতে বসলে চলে না।'

সঞ্জীব অদ্ভুতভাবে একটু হাসবার চেষ্টা করেন, বলেন, 'তা চলবে কেন ? তখন শরীরে কতো তেজ ! আমার বাপ-পিতামহ মানুষের রক্ত দেখলে আহ্লাদে লাফিয়ে উঠতেন। এতদিন পর তার চমৎকার হিসাব-নিকাশ হয়ে গেল। মজা দেখেছ ?'

ভেতরের অবস্থা যখন এই রকম, রায়বাড়ির বাইরের অবস্থাটা তখন আরও শোচনীয়। রায়বাড়িতে আর আলো জ্বলে না, লোকজন সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা করতে এসে বাইরে থেকে ফিরে যায়। রামচরণকে সব সময় কর্তার কাছে হাজির থাকতে হয় বলে তাঁর হাঁকডাক পর্যন্ত বন্ধ। চাকর-দরোয়ানগুলো বসে বসে ঝিমোয়, বারান্দার ঢাকাই খিলানের ফাঁকে ফাঁকে ঘুঘু আর পায়রার গলার আওয়াজ সমস্ত দৃশ্যটাকে যেন করুণতর করে তোলে।

রায়বাড়ির আবহাওয়া ঝিমিয়ে পড়ল, কিন্তু গঙ্গার স্রোত আর সময়ের স্রোত থেমে যায়নি। দিনের পর রাত আসে যথারীতি, মাসের পর মাসও কেটে যায়।

দায়রায় অনিলের মামলা ওঠবার আগেই একদিন অনেক রাতে রায়বাড়িতে শঙ্খধ্বনি শোনা গেল। অনেকদিন পরে রায়বাড়ির ভেতরে ও বাইরে সেদিন ঘণ্টাকয়েকের জন্যে যেন বেঁচে থাকার একটু পরিচয় পাওয়া গিয়েছিল। মোটরগুলো ডাক্তারদের আসা-যাওয়ার জন্যে বার কয়েক গ্যারেজ ছেড়ে বার হয়েছিল এবং কিছুক্ষণ পরে বাড়ির ভেতরে শঙ্খধ্বনি করেছিল বরুণা নিজে।

ওপরের ঘর থেকে শাঁখের আওয়াজ শুনে সঞ্জীব নিমাইকে ডেকে জিজ্ঞেস করেছিলেন, 'ব্যাপার কি রে নিমাই? এতরাত্রিতে হট্টগোল কিসের?'

নিমাই মাথা চুলকাতে চুলকাতে বলেছিল, 'বড় দিদিমণির খোকা হয়েছে হুজুর—'

সঞ্জীব উঠে বসলেন, 'খোকা! ব্যাটা ছেলে?'

—'হ্যাঁ কর্তা। আমি নিজের কানে কান্নার শব্দ শুনে এলাম।'

সঞ্জীব এ-ব্যাপারের বিন্দুবিসর্গও জানতেন না এবং কথাটা তাঁকে জানাবার সাহস পর্যন্ত কোনদিন কারও হয়নি। কাজেই প্রথমে কথাটা বিশ্বাস করা তাঁর পক্ষে শক্ত হয়েছিল। কিন্তু নীচের তলায় হঠাৎ যে-রকম কর্মব্যস্ততার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছিল তাতে খানিক পরেই তিনি নিমাইয়ের কথাব সত্যতা সম্বন্ধে নিঃসংশয় হলেন। খোকা! পুরুষ মানুষ!—অনেকদিন পরে বৃদ্ধ সঞ্জীবের শরীরে যেন বিদ্যুতের ঢেউ খেলে গেল।

সঞ্জীব যে-ঘরে থাকতেন, তারই একপাশে ক্যাম্পখাট পেতে রামচরণের শোবার ব্যবস্থা হয়েছিল। এই হট্টগোলের মধ্যেও তার ঘুম ভাঙেনি। সঞ্জীব নিজের বিছানা থেকে উঠে গিয়ে ডাকাডাকি করে রামচরণের ঘুম ভাঙালেন। উঠে সে বললে, 'বড় দিদিমণির খোকা হয়েছে?'

—'তুমি জানলে কি করে?'

রামচরণই শহর থেকে ডাক্তার-নার্স প্রভৃতির ব্যবস্থা করে এসে তবে শুয়েছিল। বললে, 'আমি জানতাম।'

—'হুঁ। তোমরা সবাই বেশ চালাক-চতুর হয়ে উঠেছ।'—সঞ্জীব বললেন—'কিন্তু রায়বাড়ির বড় মেয়ের ছেলে হয়েছে, এর মধ্যে এত লুকোচুরি কেন রামচরণ? নিমাইটা খবর দিয়েছে, ওকে কাল সকালে একখানা গিনি বখশিশ করবে।'

রামচরণ সম্মতি জ্ঞাপন করে আবার শোবার উদ্যোগ করছিল।

সঞ্জীব বললেন, 'কাল সকালে উঠে কলকাতায় যাবে। মন-পাঁচেক সন্দেশ, কয়েক গাঁট কাপড়, আর পিতল-কাঁসার তৈজসপত্র একেবারে সঙ্গে করে আনা চাই—গাঁয়ে বিলোতে হবে।'

রামচরণ সম্মতি জানিয়ে শুয়ে পড়ল। সঞ্জীব সারা রাত ঘুমোতে পারলেন না।

সকালে ঘুম থেকে উঠে সঞ্জীব রীতিমত সোরগোল আরম্ভ করে দিলেন। বাড়ির পুরোহিতকে ডেকে নবজাত শিশুর জন্মক্ষণ বিচার করতে দিলেন এবং নিজে ঘরের ভেতর ঢুকে একছড়া সোনার হার দিয়ে নাতির মুখ দেখে এলেন। বাড়ির আবহাওয়াটা হঠাৎ যেন সরল হয়ে এল, পাড়ার পাঁচজনে এল খবর নিতে, আর ঘরের মধ্যে পড়ে অরুণা যেন চোখ বুজে মনে মনে মৃত্যুকামনা করল। এই উৎসব ও হট্টগোল বিরাট একটা তামাশার মত তার কাছে হাস্যকর মনে হতে লাগল।

রামচরণ সকালের ট্রেনেই কলকাতা গিয়েছিল, সন্ধ্যার মুখেই ফিরে এল। তারপর শুরু হল মিষ্টান্ন, নতুন কাপড় ও তৈজসপত্র বিতরণের পালা। সঞ্জীবের নির্দেশমত বরুণাই কোন্ বাড়িতে কি পাঠাতে হবে তার ব্যবস্থা করে দিল।

সঞ্জীব অনেকদিন পরে সেদিন বারবাড়িতে এসে বসেছিলেন। কাজ-কর্ম সেরে রামচরণ ঘরে ঢুকল। সে যেন কিছু একটা বলবার সুযোগ খুঁজছিল।

সঞ্জীব তার মুখের দিকে চেয়ে বললেন, 'কি খবর রামচরণ? টাকাকড়ি আরো কিছু প্রয়োজন নাকি?'

বামচরণ বললে, 'আজ্ঞে না। একটা কথা বলবো ভাবছিলাম।'

—'বেশ তো। তার এতো ভূমিকা কেন?'

ভূমিকার একটু প্রয়োজন ছিল। কলকাতায় এক ফাঁকে রামচরণ অরুণাদেব বাড়ির দিকে গিয়েছিল। একেবারে অকারণেও যায়নি। মাস দুয়েক আগে কলকাতা থেকে অরুণার নামে একখানা চিঠি এসেছিল। চিঠিখানা উল্লেখযোগ্য কোন ব্যক্তির নয়, অনিলের বাড়ির বেয়ারাশ্রেণীব একটা লোকের। চিঠিখানা রামচরণ খুলে পড়েছিল। চিঠির লেখক বিস্তর অনুযোগ করে জানিয়েছিল যে তাদের অনেকেরই ছ-সাত মাসের মাইনে বাকী; সাহেব ও অরুণা দু-চারমাসের মধ্যে ফিবরে আশা করে এতদিন তারা চুপ করে ছিল, কিন্তু পেটের দায়ে আর অপেক্ষা করা সম্ভব নয়। তাছাড়া কয়েকজন লোক প্রায়ই এসে সাহেবের খোঁজ করছে, কেউ এসে সাহেবের নামে নালিশ করার ভয় দেখাচ্ছে, কেউ ভয় দেখাচ্ছে বাড়ি 'সীল' করবার। এই অবস্থায় অরুণা যদি একবার নিজে কলকাতায় আসে এবং আবশ্যক ব্যবস্থা করে যায়, তাহলে তারা এ-বাড়ি ছেড়ে অন্য জায়গায় কাজকর্মের চেষ্টা করতে পারে। আরও অনেক কথাই লোকটা লিখেছে। কিন্তু

বাড়ির কর্তা এবং বড় মেয়ের মনের অবস্থা বিবেচনা করে রামচরণ কথাটা কারুর কাছে উল্লেখ পর্যন্ত করেনি। তবে এবার কলকাতায় গিয়ে সে স্বচক্ষে অবস্থাটা দেখে আসবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু চেষ্টা করতে গিয়ে যা দেখে এবং শুনে এল তাতে রামচরণ নিজেই মনে মনে অপরাধী বোধ করতে লাগল। কথাটা এবার সে রায়মশাইকে জানাবার জন্যে প্রস্তুত হল।

সঞ্জীবের কথার উত্তরে রামচরণ বললে, 'ঘুরতে ঘুরতে বড়দিদিমণির বাড়ির দিকে গিয়েছিলাম। ভাবলাম, কি হচ্ছে না হচ্ছে একবার দেখেই আসি। কিন্তু যা দেখলাম—'

—'কি, দেখলে কি ?'

—'বাড়ি বন্ধ, কোর্টের লোকে এসে 'সীল' করে গেছে। চাকর-বাকরগুলো কে কোন্‌দিকে সটকেছে তার কোন ঠিকানা নেই। খবর নিয়ে জানলাম, ব্যাঙ্ক থেকে জামাইবাবু মোটা টাকা ধার নিয়েছিলেন, সেই দায়ে নালিশ করে ব্যাঙ্ক ডিক্রি পেয়েছে। বাড়িটা কয়েকদিনের মধ্যে নিলেমে চড়বে।'

সব শুনে সঞ্জীব চুপ করে রইলেন। তারপর বললেন, 'তুমিও তো দেনার দায়ে কত লোকের ভিটেয় ঘুঘু চরিয়েছ রামচরণ, এতে আশ্চর্য হবার কি আছে ?'

রামচরণ আমতা আমতা করে বললে, 'আজ্ঞে তা নয়। তবে দিদিমণির একটা আশ্রয়···সেটাও গেল শেষ পর্যন্ত।'

—'ও সব কথা আমাকে শুনিয়ো না রামচরণ। আমার ভালো লাগে না।'—সঞ্জীব হঠাৎ রুখে উঠলেন—'যে যা খুশি করুক। আমি এবার হরিদ্বারে পালাবো।'

কিন্তু রায়বাড়ি ছেড়ে এক পা যাবার উপায় তাঁর ছিল না। কতদিনের কত আনন্দ ও বেদনার ইতিহাস এই বাড়ির আনাচে-কানাচে সঞ্চিত হয়ে আছে; কত পাপ, কত পুণ্য; কত দান, কত

অত্যাচার; কত অভিশাপ, কত আশীর্বাদ।...সে সব ছেড়ে সঞ্জীব যাবেন কোথায়?

তার ওপর একটা নতুন বন্ধন জুটেছে। অরুণার ছেলে। একুশ দিন পরে অরুণা যেদিন আঁতুড় থেকে বার হল, সেদিনই তিনি ছেলেটাকে কোলে তুলে নিলেন। ধবধবে ফ্লানেলের ওপর শায়িত ছোট ছেলেটিকে কোলে নিয়ে তাঁর মনে হল, কে যেন তুলোর ওপর এক-রাশ তুলতুলে আঙুর সাজিয়ে রেখেছে। তার অপরিপুষ্ট আঙুলগুলো হাত দিয়ে সন্তর্পণে নাড়তে নাড়তে বললেন, 'শালার রং দেখেছো? একেবারে সাহেব!'

এবং সেইদিন থেকে ছেলেটিকে নিয়ে কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করা তাঁর নিত্যকর্মে পরিণত হল। শুধু সঞ্জীব নয়, অরুণা এবং বরুণা পর্যন্ত এই ছেলেটিকে কেন্দ্র করে, অন্ততঃপক্ষে কিছুক্ষণের জন্য আপন আপন দুঃখ ভুলে থাকবার চেষ্টা করতে লাগল। মৃত্যুর ক্ষতের ওপর নব-জীবনের প্রলেপ পড়ল।

অরুণা ছেলের নাম রাখলে রজত।

দায়রা আদালতে যথাসময়ে মামলা উঠল। তেইশ দিন শুনানীর পর, উকিল ও ব্যারিস্টারদের সওয়াল জবাব, সাক্ষীদের জেরা ও জবানবন্দি এবং জুরিকে জজের চার্জ বুঝিয়ে দেবার পর, রায়ও একদিন বার হল। আসামী এক সম্ভ্রান্ত বংশের জামাই, নিজে শিক্ষিত এবং সুরুচিসম্পন্ন বলে খ্যাতি আছে; রায় দেবার দিন আদালত লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। ছোটতরফের ভবশঙ্কর চৌধুরী পাত্রমিত্র পরিবেষ্টিত হয়ে রায় শুনলেন। জুরির সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত অনুসারে আসামীর প্রতি প্রাণদণ্ডের আদেশ হল।

ভবশঙ্করের চেষ্টায় মামলা যেভাবে সাজান হয়েছিল তাতে রায় অন্যরকম হবে কেউ আশা করেনি; উপরন্তু আসামী প্রথম থেকেই কোন কথা বলতে রাজী হয়নি। কাজেই আশ্চর্য কেউ হল না। রায়ের শেষ অংশে জজ যখন বললেন, "……Shall be hanged, until you are dead…" তখন ভবশঙ্করের মুখের দিকে চাইলে মনে হতে পারত যে পুত্রশোক তিনি ভুলে গেছেন। দণ্ডাদেশ শুনে আসামী কিন্তু কাঠগড়ায় কোনরকম চাঞ্চল্য প্রকাশ করেনি। আদালত কক্ষের কড়িকাঠগুলোর দিকে চেয়ে একটু হেসেছিল মাত্র।

বেগমপুরের সবাইকে লুকিয়ে রামচরণও সেদিন সদরে গিয়েছিল। আদালতে বসেই সে জজের রায় শুনে এল। রায়বাড়িতে যখন ফিরল তখন রাত আটটা। সেটা যে অনিলের রায় দেবার দিন সেটা সবাই, সঞ্জীব থেকে অরুণা পর্যন্ত, জানত। সবাই মনে মনে দুঃসংবাদের জন্যে প্রস্তুত হয়েছিল। কিন্তু মুখ ফুটে কাউকে কোন কথা জিজ্ঞেস করবার সাহস বা উৎসাহ ছিল না কারও। ফাঁসিকাঠ থেকে অনিলকে যে ফেরান যাবে না সেটা সবাই একরকম নিঃসংশয় বলে ধরে নিয়েছিল।

রামচরণ যে সবাইকে লুকিয়ে আদালতে রায় শুনতে গিয়েছে সেটা সঞ্জীব অনেকক্ষণ আগেই বুঝতে পেরেছিলেন। কাজেই রাত্রিতে সে যখন শুষ্ক বিমর্ষ মুখে সঞ্জীবের সামনে এসে দাঁড়াল, তখন তিনি নিজে থেকে হঠাৎ কোন কথা জিজ্ঞেস করতে পারলেন না।

রামচরণের পক্ষে কিন্তু বেশীক্ষণ চুপ করে থাকা সম্ভব ছিল না। ঘরের মধ্যে অকারণ কয়েকবার ঘোরাফেরা করে একসময় বললে, 'ফাঁসির হুকুম হয়ে গেল।'

—'হুঁ।'

—'আদালতে এমন ভিড় কখনো দেখিনি।'

—'বেঁচে থাকলে আরো অনেক কিছু দেখবে।'

—'বেইমশাই আনন্দে আটখানা। আদালতের বাইরে আমার

সঙ্গে দেখা হতে বললেন, খবরটা রায়মশাইকে তাড়াতাড়ি দিতে ভুলো না।'

সঞ্জীব গড়গড়ার নলে একটা টান দিয়ে বললেন, 'বললে বুঝি?'

—'তাই তো বললেন। সঙ্গে ক'জন বন্ধু-বান্ধব ছিল। আমাকে দেখিয়ে তাদেব সঙ্গে কী হাসাহাসি!'

সঞ্জীব অনেকক্ষণ কোন কথা বললেন না। কেবল দেওয়াল-ঘড়িটার একঘেয়ে টকটক শব্দ ঘরের নীরবতা ভঙ্গ করতে লাগল। এইভাবে পাঁচ-সাত মিনিট কেটে গেল। তারপর সঞ্জীব গড়গড়ার নলটা ছেড়ে ।দয়ে বললেন, 'কাল থেকে এ-বাড়িতে খবরের কাগজ ঢোকা চলবে না।'

রামচবণ আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে চাইল।

সঞ্জীব বললেন, 'আদালত বায় দিয়েছে, বাড়ির ভেতব একথা যেন কেউ জানতে না পারে।'

বামচবণ ম্লান হেসে বললে, 'কিন্তু বাড়ির বাইরে কথাটা চাপা থাকবে না। সবাই শুনবে।'

সঞ্জীব আর একবার 'হুঁ' বলে চুপ করে রইলেন। আবার কিছুক্ষণ কেটে গেল। তাবপর সঞ্জীব উঠে দাঁড়ালেন এবং বললেন, 'এ হবে না।'

বামচরণ এবাবও তাঁর কথার মর্মোপলব্ধি করতে পারলে না।

সঞ্জীব নিজেই কথাটা পরিষ্কার করে বুঝিয়ে দিলেন। বললেন, 'সেসন কোর্টের রায় পালটাতে হবে।'

রামচরণ মনে মনে খুশী হল, কারণ এটাই সে চাইছিল। মামলা-মকদ্দমায় তার শরীরে যেন নতুন প্রেরণা আসে। কিন্তু এক্ষেত্রে তার একটু সন্দেহ ছিল। তাই বললে, 'গোড়া থেকে তদ্বিব করলে রায় অন্যরকম হত। কিন্তু এখন কি……।'

সঞ্জীব বললেন, 'এখনো ঢের উপায় আছে। প্রথমে হাইকোর্ট, তারপরে সুপ্রীম কোর্ট। ভবশঙ্কর চৌধুরীর হাসি বন্ধ করতে হবে। আমার জামাই অন্ততঃ ফাঁসিকাঠে ঝুলবে না। আমি দিন দুয়েকের মধ্যে কলকাতা যাবো, তুমি ব্যবস্থা কর।'

সকলের সঙ্গে অরুণাও কথাটা একসময় শুনল। সে কাঁদল না, কোন রকম চাঞ্চল্যও প্রকাশ করল না। শুধু রজতকে একবার নিবিড় করে বুকের মধ্যে চেপে ধরল। তার মনে হতে লাগল, এ দণ্ড কেবল অনিলের নয়, এ সঙ্গে তারও। অনিলের জীবননাট্যের ওপর যবনিকা পড়ে যাবে, হয়ত মাসখানেকের মধ্যেই; কিন্তু তাকে এই বাড়ির সকলের কোপদৃষ্টির সামনে বেঁচে থেকে তিলে তিলে মরতে হবে।

ডিক্রির বলে ব্যাঙ্ক যে অনিলের বাড়িখানা নিলাম করছে সে খবর সঞ্জীবের মারফতে বরুণা এবং বরুণার মারফতে অরুণা যথাসময়েই শুনেছিল, কিন্তু তার জন্যে দুঃখবোধ করেনি এতটুকু। বাড়িটা যাতে উদ্ধার করা যায়, বরুণা সে জন্যে সঞ্জীবকে অনুরোধ করতে চেয়েছিল, অরুণা রাজী হয়নি। কিন্তু দায়রা জজের রায় কানে পৌঁছবার পর অরুণারও মনে হল, বিরাট একটা পরিহাসের মত তারও আর বেঁচে থাকার কোন প্রয়োজন নেই। যত দিন সে বেঁচে থাকবে ততদিন সবাই তাকে দেখে মনে মনে হাসবে আর বলবে,—এই মেয়েটির স্বামী মানুষ খুন করে ফাঁসিতে ঝুলেছে, কোথাও তার জন্যে এতটুকু আশ্রয় পর্যন্ত রেখে যায়নি। তার চেয়ে পটাসিয়াম সায়ানাইড বা অন্য কোন একটা উগ্র বিষ ঢের ভাল।

রাত্রে বিছানায় শুয়ে অরুণা এই সব কথা ভাবছিল। ঠিক সেই সময়েই রজতের ঘুম ভেঙে গেল। ছোট ছোট হাত দুটি দিয়ে অন্ধকারের মধ্যে সে অরুণার বুক খুঁজতে লাগল। গায়ে হাত

লাগতেই অরুণা যেন চমকে উঠল। কে যেন তাকে বললে, 'এ-কথা তোমায় ভাবতে নেই।'

শুভেন্দু বলেছিল, 'জীবনে দুঃখ আছে, আর চিরকাল থাকবেও অরুণাদি; কিন্তু সেইটেকেই বড় হতে দেবেন না।—কথাটা মনে পড়ে যেতে অরুণা যেন নিজের মধ্যে অনেকখানি শক্তি খুঁজে পেয়েছিল।

দিন তিনচার পর সঞ্জীব সত্যিই কলকাতা যাবার জন্য প্রস্তুত হলেন। রামচরণ জিজ্ঞেস করলে, 'কোথায় গিয়ে উঠবেন?'

সঞ্জীব বললেন, 'এ কাণ্ডের পর আত্মীয়-স্বজনের কাছে আমি মুখ দেখাতে পারবো না রামচরণ।'

রামচরণ মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল। যেন সবই তার দায়। কেউ মনের কথাটা খুলে বলবে না; সব তাকেই অনুমান করে নিতে হবে। একটু চুপ করে থেকে সে বললে, 'তাহলে কি কোন হোটেলে তার করে দেবো?'

—'কেন, হোটেল ছাড়া কি অতবড় শহরে কোথাও আশ্রয় মিলবে না?'

রামচরণ হতাশ হয়ে আর কিছু জিজ্ঞেস করলে না। সঞ্জীব বরুণাকে দিয়ে অরুণা আর রজতকে ডেকে পাঠালেন। অনিলের মামলার রায় বেরোবার পর অরুণা সাধ্যমত তাঁকে এড়িয়ে চলছিল। বরুণা কিংবা আর কারও হাতে ছেলে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দিত—পারতপক্ষে তাঁর সামনে যেত না। সেদিনও কী একটা অজুহাতে নিজের ঘরেই বসে থাকবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু বরুণা ছাড়ল না।—

বললে, 'বাবা কয়েকদিনের জন্যে কলকাতা যাচ্ছেন। ফিরতে দেরিও হতে পারে। এ সময়টা মন ভার করে ঘরে বসে থাকিসনি।'

অগত্যা রজতকে কোলে করে অরুণা বরুণার সঙ্গে সঞ্জীবের ঘরের এককোণে গিয়ে দাঁড়াল। অরুণার পরিধানে সরু চুলপাড় একখানা কাপড়, হাতে একগাছি করে সরু চুড়ি, মাথার চুলগুলো রুক্ষ আর এলোমেলো, পাঁচ-সাতদিন তেলও পড়েনি। সেই অবিন্যস্ত কেশপাশের মধ্যে সীমন্তের ক্ষীণ সিন্দূর রেখাটুকু ভাল করে চোখেও পড়ে না।

অরুণার দিকে চোখ পড়তেই সঞ্জীব বললেন, 'এখন থেকেই নরুন পাড় কাপড় আর একগাছি করে চুড়ি হাতে দিয়ে স্বামীর অমঙ্গল কামনা শুরু করে দিয়েছ? সিঁথির সিঁদুরটুকু আছে, না তাও গেছে?'

অরুণার উত্তর দেবার কথা নয়।

আজ সঞ্জীবের সর্বপ্রথম মনে হল, এই মেয়েটির প্রতি এতদিন বোধহয় তিনি অবিচারই করে এসেছেন। একটু কঠিন কণ্ঠে তিনি বললেন, 'যাও, ভালো একখানা কাপড় পরে এসো, নইলে কলকাতায় যেতে পা উঠবে না।'

অরুণা 'না' বলতে পারল না। নিজের ঘরে গিয়ে একখানা শাড়ি পরে এসে আবার সঞ্জীবের সামনে দাঁড়াতে হল।

সঞ্জীব বললেন, 'আমি কলকাতায় যাচ্ছি, অনিলের হয়ে হাইকোর্টে আপিল করবো। বরুণার কাছে সব কথাই আমি শুনেছি। তোমরা ভেবো না। শেষ বয়সে ভবশঙ্করের কাছে হার স্বীকার করা আমার চলবে না।'

একটু থেমে রজতের দিকে চেয়ে বললেন, 'ও-শালার জন্যে কি কি আনতে হবে একটা ফর্দ করে দে। আজকাল ছেলেদের ফ্যাশন-ট্যাশনগুলো আমার তো আবার জানা নেই।'

বরুণা বললে, 'কলকাতায় কোথায় থাকবেন বাবা? ঠিকানা তো দিলেন না—'

সঞ্জীব রজতকে দেখিয়ে বললেন, 'কেন ঐ শালার বাড়িতে। ওর কি কিছু নেই নাকি?'

অরুণা আর বরুণা দুজনেই আশ্চর্য হয়ে সঞ্জীবের মুখের দিকে চেয়ে রইল।

তিনি বললেন, 'ও সাহেব-বাচ্চার কি এ-পাঁড়াগায়ে মন টিকবে মা? তাই ব্যাঙ্কের সঙ্গে ব্যবস্থা করে বাড়িখানা আমি শালার নামে খরিদ করে নিয়েছি। আমার এক বন্ধু থাকেন কলকাতায়, ঝুনো অ্যাটর্নী। তিনিই সব করিয়ে রেখেছেন, মায় চাকর-বাকর বয়-খানসামা পর্যন্ত রেডী। কলেজে পড়বার বয়স হলেই শালাকে কলকাতায় পাঠিয়ে দেব। এখন আমি আর রামচরণ সেখানে গিয়েই উঠব।'

রামচরণ কাছেই দাঁড়িয়েছিল, তার দিকে চেয়ে সঞ্জীব বললেন, 'দেখেছো রামচরণ, তোমাকে বাদ দিয়েও এসব কাজ আমি কেমন করতে পারি?'

রামচরণ কথা বলল না। সঞ্জীব মস্ত একটা তামাশা করেছেন মনে করে থেকে থেকে হেসে উঠতে লাগল।

রামচরণকে সঙ্গে নিয়ে সঞ্জীব কলকাতায় এলেন। তাঁর বাল্যবন্ধু অ্যাটর্নী সোমেশ্বর বসু আগে থেকেই সব ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন,—সে কথা সঞ্জীব মিথ্যে বলেননি। সোমেশ্বরকে সঞ্জীব খবরের কাগজে একটা বিজ্ঞাপন দিয়ে দিতে বললেন। অনিলের কাছে কারুর যদি কোনরকম দাবি-দাওয়া থাকে তবে যেন সে সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা করে।

অনিলের বাড়িখানা দেখে সঞ্জীব খুশী হলেন। রামচরণ গেল বামুন-চাকরকে কাজকর্ম বুঝিয়ে দিতে, সঞ্জীব ঘুরে ঘুরে বাড়ির

ঘরগুলো দেখতে লাগলেন। বাড়িতে 'সীল' পড়বার আগে চাকর-বাকরগুলো জিনিসপত্র কিছু কিছু সরিয়েছে নিশ্চয়। তবুও যা আছে তা দেখবার মত।

রামচরণ ঘরে ঢুকতে সঞ্জীব বললেন, 'অনিলের রুচি ছিল রামচরণ, আসবাবপত্তর দেখে তো তাই মনে হয়।'

রামচরণ বললে, 'হাজার হোক, কত পয়সা খরচ করে দেশবিদেশ ঘুরে এসেছেন --'

--'থামো!' --সঞ্জীব ধমকে উঠলেন। এই দেশবিদেশ ঘুরে আসার কথাটাকেই তিনি পছন্দ করতে পারেন না।—'তোমাকে আমি খোসামোদ করতে বলিনি। একটা কথা জিজ্ঞেস করলে সাতটা আবোলতাবোল না বকে তুমি থামবে না।'

রামচরণকে থামতে হল।

সঞ্জীব বললেন, 'চাকর-বাকরগুলোকে বলে দেবে, বাড়ির একটা জিনিসপত্রও যেন এদিক-ওদিক না হয়, যেমনটি আছে ঠিক তেমনি থাকা চাই। তুমি আমার নামে খরচ লিখে প্রতিমাসে ওদের মাইনে পাঠিয়ে দেবে।'

রামচরণ বললে, 'খোকাবাবু বড়-সড় না হলে দিদিমণি কি আর এ-বাড়িতে আসবেন? ততদিন ধরে মিছিমিছি—'

সঞ্জীব আবার রেগে উঠলেন, 'নায়েবী বুদ্ধি আর বলে কাকে! খোকাবাবুর বাপ বুঝি আর কোনদিন ফিরে আসবে না, চিরকাল জেলে বসে ঘানি টানবে? তাকে ঘর-সংসার করতে হবে না, ছেলেটাকে মানুষ করে তুলতে হবে না?'

দিন দশেকের মধ্যে কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে হোটেলের লোক, অনিলের বন্ধু শরদিন্দু আর কয়েকজন চাকর-বাকর সঞ্জীবের কাছে এসে

পাওনা-গণ্ডা বুঝে নিয়ে গেল। সঞ্জীব যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

শরদিন্দুর টাকাটা মিটিয়ে দেবার ব্যাপারে রামচরণ আপত্তি তুলেছিল; হ্যাণ্ডনোট নেই, কোন রকম লেখা নেই, শুধু শুধু এতগুলো টাকা…

সঞ্জীব বলেছিলেন, 'পাওনা না থাকলে ভদ্রলোকের ছেলে আমার সামনে দাঁড়িয়ে কখনো কথা বলতে পারে?'

রামচরণ কথাটা তবু মেনে নিতে পারেনি।—'কলকাতার লোক সব পারে হুজুর, আমি অনেক দেখেছি।'

—'তুমি থামো রামচরণ। তোমার মত নায়েবী বুদ্ধি নিয়ে বেঁচে থাকতে হলে আমাকে আজ সত্যিই কাশী যেতে হত। সামান্য কটা টাকার জন্যেই আমার সংসারে এতবড় একটা বিপর্যয় ঘটে গেল, সে-খোঁজ রাখো? টাকা আমি সঙ্গে নিয়ে যাবো না, পাবে আমার মেয়ে-জামাই। সেদিন ঘুণাক্ষরেও কথাটা জানতে পারলে আমি হতভাগাটাকে আমার সিন্দুক খুলে দিতুম।'

সঞ্জীবের গলাটা যেন ধরে এল।

দিন দুই পরে। সঞ্জীব যখন আহ্নিক করতে বসেছেন, সেই সময় রামচরণ এসে বললে, 'কোটপ্যাণ্ট পরা এক ভদ্রলোক আপনার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে।'

সঞ্জীব হাত নেড়ে আগন্তুককে বসাবার ব্যবস্থা করতে বললেন।

খবরের কাগজে বিজ্ঞাপন দেখে সিদ্ধার্থ লাহিড়ী সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিল। গরদের কাপড়, গলায় রুদ্রাক্ষের মালা, কপালে রক্তচন্দনের টিকা পরে সঞ্জীব যখন বাইরের ঘরে ঢুকলেন, সিদ্ধার্থ তাঁকে দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল। চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়িয়ে

সে বললে, 'আমি অনিলের শ্বশুরমশায়ের সঙ্গে দেখা করতে এসেছিলাম। আমি তার বন্ধু।'

পরিচয় শুনে রামচরণ ভাবল, আপদ। সঞ্জীব কিন্তু খুশী হয়ে উঠলেন, বললেন, 'বেশ করেছেন। এ তো আপনাদেরই বাড়ি। আমিই তার শ্বশুর। কি করতে হবে বলুন—'

সঞ্জীবের সাজসজ্জা দেখে সিদ্ধার্থ একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল, কথা শুনে সে-ভাবটা কেটে গেল। বললে, 'অ্যাটর্নী সোমেশ্বর বোসের কাছে খোঁজ নিতে গিয়ে শুনলাম, অনিলের আপিলেব জন্যে আপনি কলকাতায় এসেছেন '

—'ইচ্ছে তো তাই। অনেক তদ্বিব করে আমি তাকে কলকাতার জেলে ট্রান্সফাব কবাব ব্যবস্থা করেছি। কিন্তু যে-রকম বোকা ছেলে, রাজী হবে কিনা বলা শক্ত।'

—'আমি তাকে যতদূব জানি তাতে সে সহজে রাজী হবে বলে ত মনে হয় না। নইলে আমি নিজেই আপিলেব বন্দোবস্ত করব ভেবেছিলাম এবং খববের কাগজে মামলার বায় পড়ে হাইকোর্টে দরখাস্তও একটা করে রেখেছিলাম '…অনিল যে সুস্থচিত্তে, সজ্ঞানে এ-কাজ করতে পারে, তা আমি এখনো বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। কিন্তু নানা কাজে বর্ধমানে গিয়ে ওব সঙ্গে দেখা করাটা আব হয়ে ওঠেনি। আপনি ওকে যদি কলকাতায় ট্রান্সফার কবার ব্যবস্থা করে থাকেন, তাহলে আমি যত শিগগির পারি ওর সঙ্গে দেখা করে দেখবো। আমি নিজে ব্যারিস্টাব। একই সঙ্গে আমবা বিলেতে পড়তে গিয়েছিলাম।'

সঞ্জীব বললেন, 'এ তো খুব আনন্দের বিষয়। দিন দুইয়ের মধ্যেই ওব কলকাতায বদলী হবার কথা। কিন্তু তাব সঙ্গে দেখা করতে কেমন যেন সংকোচ বোধ কবছিলাম। কাবণ, নিজে আমি ওব প্রতি অবিচাব বড় কম করিনি। আপনি তার বন্ধু, আপনি যদি দেখা

করে তাকে আপিলের ব্যাপারে রাজী করাতে পারেন তবে তো সবদিক দিয়েই ভাল হয়। এদিকে আমার পক্ষে যতটুকু করা সম্ভব তাও আমি করবো।'

—'আপনারা ওকে কিভাবে দেখেছেন জানি না। কিন্তু আমাদের দলে অতবড় শিক্ষিত, কালচার্ড আর গুণী কেউ ছিল না। আপনারা ওর পক্ষে কোন রকম চেষ্টা করেননি জেনে বড় দুঃখিত হয়েছিলাম।'

সঞ্জীব অপরাধীর মত বললেন, 'বুড়ো বয়সে মানুষের মতিভ্রম হয় বাবা। আর সহজ ব্যাপারগুলোকে আমরা কত জটিল করে দেখি।...কিন্তু এখন কি আর ফেরানো যাবে?'

সিদ্ধার্থ বললে, 'আপনি ভাববেন না, মিস্টার রায়। আইনগুলো যদি পাথর দিয়ে তৈরী না হয়ে থাকে, তবে ফাঁসিকাঠ থেকে ওকে আমরা ফিরিয়ে আনবো।'

বেগমপুরের দারোগা যখন হাতকড়া পরিয়ে অনিলকে থানায় নিয়ে গিয়েছিলেন তখন তার মনেব অবস্থাটা ছিল অনেকটা নিদ্রা ও জাগরণের মধ্যে। কি ঘটেছে এবং তার পরিণতিই বা কোথায় সে সম্বন্ধে তার মনের মধ্যে কোন সুস্পষ্ট ধারণাই ছিল না। চারিদিকে সমস্ত পরিবেশই তার অবান্তর বলে মনে হয়েছিল। তারপর থানা থেকে হাজতে এবং হাজত থেকে জেলে। জেলে এসে অনিলের মনে হল, সে এক স্বতন্ত্র পৃথিবীতে এসে পড়েছে। সেখানকার খুনী আসামীদের মধ্যে শিক্ষা ও সভ্যতার কোন বালাই নেই, ভদ্র ও অভদ্র সবাই সেখানে সমান ভিত্তির ওপর দাঁড়িয়ে। চারিদিকে কঠোর ·াসন। এবং যতখানি কঠোরতা প্রায় ততখানি শৈথিল্য। আবহাওয়াটা সস্তা রসিকতা আর বাহাদুরি নেবার চেষ্টায় কলুষিত। কে যে সত্যিকার খুনী আর কে নয়, বুঝে ওঠা রীতিমত কষ্টকর। সবারই মুখে একটা বেপরোয়া তাচ্ছিল্যের ভাব। কী আর হবে, বড় জোর ফাঁসি ়ো!···

এই পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে অনিলের একটু সময় লাগবার কথা। প্রথম প্রথম সে চুপ করে সেলের মধ্যে বসে থাকত। তাকে কেন্দ্র করে রায়বাড়ির ইতিহাসে ঝড়ের মত যে ব্যাপারটা হঠাৎ ঘটে গেল, বসে বসে অনিল সে কথাই ভাবতে চেষ্টা করত। অরুণাকে সে বিশ্বাস করেছিল, সত্যিই করেছিল, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু এখানে আসবার পর নিজের মনটাকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে .য কারণটা সে আবিষ্কার করল, তাতে তার নিজেরই চমক লেগে ়ল রীতিমত। মুক্ত আকাশে ওড়বার সময় যে কথাটা তার ভাববার অবকাশ ছিল না, পিঞ্জরে বন্দী হয়ে সেই উপলব্ধির সুযোগ তার মিলে গেল। এবিষয়ে তার এতটুকু সন্দেহ রইল না যে একটা মাত্র নারীই তার জীবন-ইতিহাসের এই বিরাট

বিপর্যয়ের জন্যে দায়ী। সে লেখাপড়া শিখবে বলেই ইউরোপে গিয়েছিল এবং ভায়োলিনের নেশাটাও হয়ত একদিন কেটে যেত, অন্ততঃ তার সমস্ত ভবিষ্যতের পথ জুড়ে দাঁড়াত না; কিন্তু বিকট যৌবনের সুরভিত পসরা নিয়ে post-war ইংলণ্ডের একটি মেয়ে যেদিন তার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল, সেদিন সে সব ভুলে গেল।

একে তো ছেলেবেলা থেকে সে মানুষ হয়েছিল সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে। তার বাবা ছিলেন রাওয়ালপিণ্ডীর মিলিটারী হাসপাতালের রেসিডেন্ট সার্জেন। সেখানে সমাজ বলে কিছু ছিল না, যাও বা ছিল তাও যেন ঠিক এদেশী সমাজের সগোত্র নয়। শেষ জীবনে তিনি কলকাতায় গিয়ে বাড়ি খরিদ করেছিলেন। অনিল দিল্লীর এক খ্রীষ্টান বোর্ডিংয়ে থেকে পড়াশুনো করত। দেশকে কিংবা দেশের মানুষকে চোখ দিয়ে দেখবার এবং মন দিয়ে জানবার সুযোগ পর্যন্ত ভাল করে সে পায়নি। কলেজ ছেড়ে বছরখানেক কলকাতায়, তার পরেই লণ্ডনে। নব-সভ্যতার যে বিষ সামান্য পরিমাণে ছেলেবেলা থেকেই তার রক্তে মিশে গিয়েছিল, অ্যানের লিপস্টিক-রঙীন অধরস্পর্শে সেটা যেন আরও উগ্র, আরও ফেনিল হয়ে উঠল। এই বিষের ক্রিয়াটা ধীরে ধীরে তার মস্তিষ্ককে পর্যন্ত আচ্ছন্ন করে ফেলেছিল, সেটা অনিল বুঝল কয়েদখানার ভেতর ঢুকে। তার সমস্ত উচ্ছৃঙ্খল জীবনযাত্রার মূলেও এই নারীরই অত্যন্ত স্বাভাবিক অন্তর্ধানের অনিবার্য প্রতিক্রিয়া। এখন এই ভেবে তাকে মাঝে মাঝে হাসি সংবরণ করতে হয় যে, সেদিন অ্যানের যে অপরাধের কল্পনায় সে হঠাৎ ক্ষেপে উঠেছিল, ঠিক সেই অপরাধে সেদিন তাকেও অভিযুক্ত করা চলত।

জেলে এসে তাই অনিল খুব বেশী দুঃখিত হয়নি। এই ভেবে সে নিজেকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করেছিল যে অন্ততঃ কিছুকালের মত সে ভদ্রভাবে বেঁচে থাকবার দুঃসহ উত্তেজনা থেকে আত্মরক্ষা করবে।

আত্মপক্ষ সমর্থনের ইচ্ছাটা তার প্রথম থেকেই ছিল না, অন্ততঃ নিজের জন্যে নয়। কারণ নিজের চারিদিকে ভ্রান্ত সম্ভ্রমবোধের যে বিচিত্র পরিমণ্ডল সে রচনা করেছিল, শুভেন্দুর বুকের রক্তে তা ম্লান হয়ে গিয়েছিল। তাছাড়া বাঙলা দেশের সম্ভ্রান্ত একটি বংশের পারিবারিক মর্যাদাকে পথজনতায় লুটিয়ে দিতে হবে মনে করেই সে প্রথম থেকে চুপ করে ছিল। সঞ্জীবের ঔদাসীন্য আর অরুণার নীরবতাও তাকে সংকল্পে অবিচলিত থাকতে বড় অল্প সাহায্য করেনি।

ধীরে ধীরে তার মনের অবস্থার অদ্ভুত পরিবর্তন ঘটে গেল। পরিমিত জলে স্নান, শ্রেণীবদ্ধ হয়ে খাবারের থালা হাতে করে দাঁড়ান, নিরাবরণ স্থানে প্রাতঃকৃত্য প্রভৃতি সমাপন, আসামী ও কয়েদীদের লুকিয়ে সংগ্রহ করা বিড়ি-গাঁজার ধোঁয়া,—জীবনের এই বর্ণলেশহীন উলঙ্গরূপ তার অনুভূতি ও অভাববোধের ওপর যেন শতছিন্ন, নোংরা একটা পর্দা বিছিয়ে দিল। যে আকাশকে সে এতদিন দিগন্তলীন অবারিত মূর্তিতে কল্পনা করেছিল, কারাকুঠরীর ঘুলঘুলির ভেতর দিয়ে তাকে সে খণ্ড করে, ছোট করে দেখতে শিখল। তাই আদালতে যেদিন তার প্রাণদণ্ডের আদেশ হল সেদিন নিজের জন্যে একটু দীর্ঘশ্বাস ফেলবার কথা পর্যন্ত তার মনে হয়নি। তারপর যেদিন তার কারা বদলের খবর এল সেদিন সে একটু আশ্চর্য হল মাত্র। ভাবল, সাধারণ ব্যবস্থাতেই এটা হয়েছে নিশ্চয়ই, কলকাতার জেলেই বোধহয় তার জীবন-নাট্যের শেষ দৃশ্যটা অভিনীত হবে।

কারা বদলের দিন দুই পরেই প্রেসিডেন্সী জেলে সিদ্ধার্থ এল তার সঙ্গে দেখা করতে। ইণ্টারভিউয়ের নির্দিষ্ট ঘরটাতে জেল-পোশাক পরা অনিল এসে পৌঁছতে সিদ্ধার্থ বলল, 'রাস্কেল!'

আর কেউ হলে হয়ত রাগ করত। অনিল শুধু একটু হাসল। বলল, 'হঠাৎ?...'

সিদ্ধার্থ বলল, 'হঠাৎ নয়, তোমার শ্বশুর আপিল করেছেন। সময়

আর বেশী নেই। আমাদেব তার জন্যে তৈরী হতে হবে। কিন্তু তুমি যতক্ষণ তোমার কথা বলতে রাজী না হচ্ছ, ততক্ষণ কিছুই হতে পারে না।'

অনিল নিস্পৃহভাবে বলল, 'আমি বললেই বা এখন কি হতে পারে?'

—'বড্ড দেরি হয়ে গেছে সত্যি। কিন্তু এখনও সময় আছে। তোমাকে সব কথা খুলে বলতে হবে।'

—'বলবার হয়ত কিছু ছিল, কিন্তু প্রবৃত্তি নেই।'

—'তবু তোমায় বলতে হবে।'

—'আদালত বিশ্বাস কববে না। তোমাদের জুরিসপ্রুডেন্সে নজির মিলবে না।'

—'গোড়া থেকে একটা ধারণা নাই বা করে নিলে। চেষ্টা কবে দেখতে ক্ষতি কি!'

—'বাংলাদেশেব একটা মস্তবড় সম্ভ্রান্ত পবিবারের মর্যাদার মুখে আরো খানিকটা কালি মাখিয়ে দেওযা হবে। সে আমি পাববো না, সিদ্ধার্থ।'

—'তোমাকে পাবতে হবে। You must. জীবনে কোনদিন তুমি শক্ত হতে পারনি। কিন্তু এখন আব ও-সব ছেলেমানুষির সময় নেই। তুমি সংসার গড়েছ, সন্তানের ভবিষ্যৎ গড়ে তোলবার দায়িত্ব রয়েছে তোমাব।'

—'সন্তান!'

—'Yes my old boy, and a male child at that! তোমার শ্বশুব তো তার কথা বলতে অজ্ঞান।'

অনিল লোহার জালটা আরও জোরে চেপে ধরল। একেবারে আশ্চর্য সে হল না, কারণ, যেদিন সে বেগমপুরে গিয়েছিল, সেদিন এই কথাটাই অরুণা বোধহয় তাকে জানাবার চেষ্টা

করেছিল। কিছুটা বুঝতে পারলেও সবটা বোঝবার মত মনের অবস্থা তার সেদিন ছিল না এবং পরেও সে কথাটা সাহস করে ভাববার চেষ্টা করেনি। অনিল আশ্চর্য হল না কিন্তু তার সমস্ত শরীরের ওপর দিয়ে অপরিদৃশ্য দুটি কোমল হাতের মধুর স্পর্শের ঢেউ বয়ে গেল। অভিভূতের মত কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, 'তুমি দেখেছো সেটাকে? How does he look? Like a prince or a mug?'

সিদ্ধার্থ বললে, 'Of course like a prince—যদিও আমি তাকে দেখিনি। তারা বেগমপুরেই আছে। কিন্তু তোমার শ্বশুর আমাকে তার ফোটো দেখিয়েছেন। Just a bonny baby, Mellin's Food-এর বিজ্ঞাপনও বলতে পারো।'

সিদ্ধার্থ হোহো করে হাসতে লাগল, আর সেই হাসির শব্দে এতদিন এত রাত্রি এতমাস ধরে অনিল নিজের মনে যে অন্ধকার পাতালপুরী রচনা করেছিল সেটা যেন ভেঙে চুরমার হয়ে যেতে লাগল। ছেলেমানুষের মত সে বলে ফেললে, 'একখানা ছবি একদিন নিয়ে আসতে পারো, সিদ্ধার্থ? আমি একবার দেখবো।'

—'নিশ্চয়ই পারি। কিন্তু তোমায় ফাঁসিকাঠ থেকে ফিরতে হবে অনিল। আর সেটা নির্ভর করছে তোমারই ওপর। আমি কাল কিংবা পরশু তোমার counsel হিসেবে তোমার সঙ্গে দেখা করতে আসবো। You must speak out your mind, then.'

অনিল 'না' বলতে পারল না। মনের মধ্যে আবার যেন বাঁচবার লোভ দেখা দিয়েছে।

সিদ্ধার্থের হাতে হাত দেবার জন্যে অনিল নিজের ডান হাতটা বাড়িয়ে দিয়েছিল, কিন্তু সেটা ঠেকে গেল তারের বেড়ায়। ওধার থেকে সিদ্ধার্থ বললে, 'রাস্কেল! এটা জেল।'

দিন দুই পরে অনিলের সঙ্গে দেখা করে সিদ্ধার্থ ঘটনার আনুপূর্বিক বিবরণ এবং সে-সম্বন্ধে অনিলের বক্তব্যটুকুও জেনে নিল। কিন্তু অভিজ্ঞ ব্যারিস্টারদের সঙ্গে পরামর্শ করে সিদ্ধার্থ দেখল আপিল-আদালতে মামলা ঢেলে সাজাবার পক্ষে আইনের দিক্ থেকে কতকগুলি অসুবিধা আছে। সেদিক থেকে কথাটা সিদ্ধার্থ ভেবে দেখেনি। কোন দিক্ থেকে কোন রকম উপায় দেখতে না পেয়ে সে যখন প্রায় হতাশ হয়ে পড়ছিল, সেই সময় এই ধরনের মামলায় অপ্রতিদ্বন্দ্বী, প্রধান ব্যারিস্টার মিঃ মুখার্জী সিদ্ধার্থকে একটা পথ দেখিয়ে দিলেন। তিনি স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন যে যদি তা করা সম্ভব হয় তবেই অনিলের প্রাণদণ্ড রহিত হতে পারে, তা ছাড়া আর উপায় নেই।

উপায়টা রীতিমত জটিল এবং সিদ্ধার্থর পক্ষে সে কথা সঞ্জীবকে বলাও রীতিমত সংকোচের বিষয়। সঞ্জীব হয়তো রাজীই হবে না। সিদ্ধার্থকে তাঁর বিরাগভাজন হতে হবে। কিন্তু অন্য উপায় যখন খুঁজে পাওয়া গেল না, তখন চুপ করে থাকলেও চলে না। শেষপর্যন্ত ব্যাপার যেরকমই দাঁড়াক, মাঝপথে সে সরে পড়বে না।

মনে মনে প্রস্তুত হয়ে সে দিনকয়েক পরে সঞ্জীবের সঙ্গে দেখা করতে গেল।

সিদ্ধার্থের কয়েক দিনের অনুপস্থিতির জন্য সঞ্জীব মনে মনে চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। তাকে দেখে তিনি বললেন, 'তারপর, হঠাৎ কদিন কোন খোঁজখবর নেই কেন সিদ্ধার্থবাবু? আমাদের রামচরণ তো ভেবেই অস্থির যে, আপনি বোধ হয় এ-যাত্রায় বুড়োকে পরিত্যাগই করলেন।'

সিদ্ধার্থ অনুপস্থিতির কারণ দেখিয়ে আসল কথাটা পাড়ল।

সঞ্জীবের ছোট মেয়ে বরুণাকে আদালতে এই মর্মে এফিডেবিট্ করতে হবে যে তার স্বামীর স্বভাব-চরিত্র বিশেষ ভাল ছিল না

এবং ঘটনার রাত্রিতে তাঁকে আসামীর স্ত্রীর কাছে আপত্তিকর অবস্থায় কদর্য একটা প্রস্তাব করতেও শোনা গিয়েছিল। আসামী এবং বরুণা স্বকর্ণে তা শুনেছিল এবং স্বচক্ষে সে দৃশ্য দেখেছিল। এই ব্যাপারেই আসামী হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে পড়ে এবং সাময়িক উন্মত্ততার মুহূর্তে···

কথাটা শুনে সঞ্জীব বললেন, 'মড়ার ওপর আবার খাঁড়ার ঘা কেন সিদ্ধার্থবাবু? আপনাদের আইন এত নীচেও নামতে পারে?'

সিদ্ধার্থ বললে, 'কথাটা খুবই খারাপ, কিন্তু এ-ছাড়া আপাততঃ অন্য কোন উপায় দেখা যাচ্ছে না।'

সঞ্জীব চুপ করে বসে রইলেন। উনিশ বছরের বিধবা বরুণার আভরণহীন মূর্তি তাঁর মনে পড়তে লাগল। এতবড় একটা দুর্ঘটনার পরে কারও সামনে সে একদিনও চোখের জল ফেলেনি। অরুণার প্রতি, অরুণার ছেলের প্রতি এতটুকুও বিরাগের ভাব পোষণ করেনি। তারই অক্লান্ত তত্ত্বাবধানে রায়বাড়ির সংসার-চক্র এখনও ঘুরছে। দাসী-চাকর থেকে নায়েব-গোমস্তা পর্যন্ত সবাই এখনও বরুণার কাছে গিয়েই দাঁড়ায়, বরুণা তাতে এত-টুকুও বিরক্ত হয় না, অপ্রসন্ন হওয়া দূরে থাক। তাই বলে এত বড় একটা মিথ্যা কথা বলবার জন্যে আদালতে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে শপথ করতে হবে?

সঞ্জীব বললেন, 'সে হয় না সিদ্ধার্থবাবু। আমি বরুণার কাছে কথাটা উচ্চারণ করতেও পারবো না।'

সিদ্ধার্থ শেষ চেষ্টা করল, বলল, 'আপনি নিজে নাই বা বললেন। একখানা চিঠি লিখে রামচরণবাবুকে বেগমপুরে পাঠিয়ে দিন। তাতে সব কথাই খুলে লিখবেন। আর এও লিখবেন যে, যদি রাজী থাকেন, তাহলে তিনি যেন রামচরণের সঙ্গে কলকাতায় চলে আসেন। কারণ, কাজটা খুব জরুরী। রামচরণবাবুর সঙ্গে তিনি যদি না আসেন তা হলেই

আমরা তাঁর মনের ভাবটা বুঝতে পারবো। তাতে আর কিছু না হোক, চক্ষুলজ্জা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে।'

রামচরণ কাছেই দাঁড়িয়ে ছিল, বললে, 'পৃথিবীর মত নোংরা কাজগুলো সব আমাকেই করতে হবে। চাকরি না ছাড়লে নরকেও আমার ঠাঁই হবে না। কিন্তু একটা কথা সিদ্ধার্থবাবুকে জিজ্ঞাসা করবো, ছোট দিদিমণি না হয় অতবড় মিথ্যে কথাটাই বললেন—তিনি যে বলবেন, একথাও আমি বেশ জানি—কিন্তু আদালত কি তা বিশ্বাস করবে? এতদিন কেন তিনি চুপ করে ছিলেন, একথা কি আদালত জানতে চাইবে না?'

সিদ্ধার্থ বললে, 'নিশ্চয় চাইবে এবং আমরা তার উত্তরও দেবো। পরলোকগত স্বামীর নামে কলঙ্কের ভয়ে তিনি এতদিন চুপ করে ছিলেন; কিন্তু একটা লোককে অন্যায়ভাবে ফাঁসিকাঠে ঝোলাবার ব্যবস্থা হচ্ছে দেখে তিনি আর চুপ করে থাকতে পারলেন না।'

সঞ্জীব বললেন, 'চমৎকার সিদ্ধার্থবাবু! পরিষ্কার উকিলের বুদ্ধি, ব্যারিস্টারীতে আপনার উন্নতি হবে। আমি চেষ্টা করে দেখবো। আমার চিঠি নিয়ে রাম আজই বাড়ি যাবে। কিন্তু বরুণা রাজী না হলেই আমরা খুশী হবো।'

সন্ধ্যার মুখে রামচরণ বেগমপুর পৌঁছেছিল। খবর নিয়ে শুনল বরুণা ওপরে। রামচরণ সঞ্জীবের চিঠিখানা নিয়ে সেখানেই হাজির হল। নিজের ঘরে বরুণা সন্ধ্যা-পূজায় বসেছিল, মৃগচর্মের ওপর শ্বেতকৌষিক পরিহিত তার ধ্যানশীলা মূর্তি দেখে রামচরণের ডাকবার সাহস হল না। সে দরজার কাছে দাঁড়িয়ে রইল। বরুণার ঘরে খাট পালঙ্ক অথবা আসবাবপত্রের কোন সমারোহ নেই; সে সব বরুণা শুভেন্দুর মৃত্যুর পরেই অন্য ঘরে চালান করে দিয়েছে। ঘরের দেওয়ালে দেব-দেবীর কয়েকটা ছবি, বরুণার বিবাহিত জীবনের

কতকগুলো ফোটো। আর মাঝখানে শুভেন্দুর প্রকাণ্ড একটা তৈলচিত্র। ধূপের ধোঁয়ায় ঘরটি আধো-অন্ধকার, সমস্ত পরিবেশের মধ্যে নিভৃত সাধনলোকের স্নিগ্ধ ছায়া।

পুজো শেষ করে বরুণা উঠে দাঁড়াল। শ্বেতপাথরের থালা থেকে জুঁইফুলের একগাছি মালা নিয়ে পরিয়ে দিল শুভেন্দুর তৈলচিত্রে—দেখে মনে হল এই মুহূর্তটিতে শুভেন্দুর মৃত্যু হয়নি। ছবির বুকে বসে সে যেন বরুণার দিকে চেয়ে হাসছে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় ঠিক এমনই ঘটে; সমস্ত দিনের নিরবসর সাংসারিক কর্তব্যের পর, এই সময়টাই বরুণার আপনাকে ফিরে পাবার লগ্ন। বাড়ির সবাই এটা জানে, তাই এইদিকটায় এই সময় বড় কেউ একটা আসে না।

রামচরণ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল। পূজারিণীর নিভৃত তপশ্চর্যার এই অপরূপ ছবি দেখে দুটি চোখ ভরে নিল এবং সঞ্জীবের চিঠিখানা জামার পকেটে ফেলে তাড়াতাড়ি চলে আসবার উপক্রম করল।

কিন্তু সেই সামান্য শব্দেই বরুণা মুখ ফিরিয়ে দরজার দিকে চাইল। এগিয়ে এসে বললে, 'কখন এলেন রামচরণ কাকা? বাবা এসেছেন?'

—'কর্তা তো আসেননি মা। আমি একাই এলাম।' - রামচরণ বিব্রত স্বরে বললে।

—'হঠাৎ একা এলেন? বিশেষ কোন দরকার হল বুঝি?'

-'হ্যাঁ, তা একটু বিশেষ রকমই বলতে হবে বইকি। তা থাক, সে অন্য সময় হবে' খন। তাড়া নেই এমন কিছু।'

তাড়া অবশ্য যথেষ্ট পরিমাণেই ছিল। সঞ্জীব সকালের ট্রেনেই তাকে ফিরতে বলে দিয়েছিলেন। এমন একটা কুৎসিত ব্যাপারে বেশীক্ষণ উদ্বিগ্নচিত্তে অপেক্ষা করবার মত ধৈর্য তাঁর নেই। কাজেই চিঠিখানা রাত্রেই অরুণার হাতে দেওয়া প্রয়োজন। ট্রেন সকাল সাতটায়। তার মধ্যে বরুণার মনস্থির করে ফেলা চাই। কিন্তু···

বরুণা বললে, 'এখন আর আমার কোন কাজ নেই কাকাবাবু, যদি আমাকে কোন কথা জানাতে বলে থাকেন, বলুন না।'

মামলা-মকদ্দমা যে কেবল উৎসাহ-উত্তেজনার খোরাকই যোগায় না, মাঝে মাঝে মানুষকে ভয়ানক বিব্রতও করে তোলে, রামচরণকে আজ সেটা সর্বপ্রথম উপলব্ধি করতে হল। কিন্তু কাজের সময় সে সহজে নিজেকে ভাবাবেগের দ্বারা বিচলিত হতে দেয় না; তাই মিনিট খানেকের মধ্যেই সে মনস্থির করে ফেলল এবং পকেট থেকে তারই হাতের লেখা সঞ্জীবের চিঠিখানা বরুণার হাতে দিয়ে বললে, 'এই চিঠিতেই সব কথা তিনি লিখেছেন। তুমি ভাল করে পড়ে দেখো। আমি সকালের ট্রেনেই কলকাতায় ফিরবো, তার মধ্যে জবাব পেলেই চলবে।'

বরুণা চিঠিখানা খুলে পড়তে আরম্ভ করতেই রামচরণ বললে, 'সেরেস্তার ক'টা কাজ রাত্রের মধ্যেই সেরে রাখতে হবে মা, আমি সেখানেই চললুম।'

রামচরণ আর দাঁড়াল না।

প্রকাণ্ড রায়বাড়ির ওপর কৃষ্ণপক্ষ রাত্রির গভীর ছায়া নেমে এসেছে। রাত প্রায় এগারোটা। বাইরে গ্রামের পথ স্তব্ধ এবং জনবিরল। রায়বাড়ির ভেতরের স্তব্ধতা তার চেয়ে বেশী। অরুণার ঝি খোকাকে দুধ খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে দিয়েছে; অরুণাও এবার ঘুমোবার চেষ্টা করবে। ঝি রাত্রে অরুণার ঘরের মধ্যেই শোয়; মাদুর বিছিয়ে সে আগেই ঘুমিয়ে পড়েছে। এবার অরুণার পালা। আলো নিভিয়ে অরুণা এবার শুয়ে পড়বে, তারপর বাইরের অন্ধকার যেন ধীরে ধীরে ঢুকে পড়বে অরুণার মনের মধ্যে। বারান্দার কার্নিসে পায়রাগুলো ঝটপট করবে, বাইরের পল্লীপথে বেওয়ারিস কুকুরগুলোর কর্কশ চীৎকারে রাত্রির সুষুপ্তি বারে বারে ভেঙে যাবে। নীচের

রান্নাবাড়িকে গোটা তিন-চার বেরাল মিলে খণ্ডযুদ্ধ বাঁধিয়ে তুলবে। চোখ বুজে অরুণা এ-সবের প্রত্যেকটি শুনতে আর দেখতে দেখতে তার মাথা আর কান যেন আগুনের মত গরম হয়ে উঠবে, দেখা দেবে যত রাজ্যের অন্ধকার ভাবনা।......

· অন্যদিন সন্ধ্যার পর বরুণা তার ঘরে এসে ঠিক ছোটছেলেবেলার মত গল্প করে, রজতকে নিয়ে খেলা করে ঠিক ছোটখুকীর মত। আজ সন্ধ্যেও থেকে বরুণাকে দেখতে পাওয়া যায়নি। কি হল তার কে জানে। রামচরণ কাকা কলকাতা থেকে এসেছেন এ-খবর-টুকুও যথাসময়ে তার কানে পৌঁচেছে, কিন্তু তিনিও একবার খোঁজ নিতে এদিকে আসেননি। একবার সে নিজেই তুজনেব খোঁজ নেবে ভেবেছিল, কিন্তু তারপরেই বজত এমন বায়না শুরু করে দিল যে ঝি ও সে তুজনে মিলে তাকে থামাতে নাস্তানাবুদ হয়েছে। তার সঙ্গে বকাবকি করতে গিয়ে অরুণাব নিজের মাথাটা ধবে গিয়েছিল অসম্ভব রকম। রজত ঘুমিয়ে পড়বাব পব এতক্ষণ সেও চোখ বুজে বিছানায় পড়ে ছিল। বামুন ঠাকুর হাঁকডাক করতে এইমাত্র সে নীচে গিয়ে যা হয় তুটি মুখে দিয়ে এসেছে। খাবার ঘরেও বরুণার দেখা পাওয়া গেল না। রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পাট বরুণার নেই; কিন্তু তরকারি কোটা থেকে চাকর-বাকর, নায়েব-গোমস্তা সকলের ব্যবস্থা একরকম সেই করে থাকে। বামুন তুটো শুধু খুন্তি নেড়ে এবং হাঁড়ি নামিয়েই খালাস। আজ কিন্তু বরুণা সন্ধ্যার পব নীচে নামেনি, দরজা বন্ধ করে নাকি নিজের ঘরেই বসে ছিল। বড় চাপা মেয়ে বরুণা, মনের কথাটা কিছুতেই মুখ ফুটে বলে না। রাগ নেই, তুঃখ নেই, একটু অভিমান পর্যন্ত না। যেন ঠাণ্ডা পাথর। মাঝে মাঝে অরুণার রাগও হয় তার ওপর। এত বড় সাংঘাতিক ব্যাপারের পরেও অরুণাকে শক্ত একটা কথা পর্যন্ত বলেনি। তার এই নির্লিপ্ততার কাছে অরুণাকে যেন প্রতিপদে ছোট হয়ে যেতে হয়, অত্যন্ত লজ্জা করে তার।

খাওয়া-দাওয়া সেরে ওপরে ওঠবার সময় অরুণা একবার বরুণার ঘরের দিকেও গিয়েছিল। কিন্তু দরজা বন্ধ দেখে ফিরে এসেছে, ডাকেনি। কাল সকালে উঠে বরুণা আর রামচরণ কাকা, দুজনের খোঁজই তাকে করতে হবে।

এই সব ভাবতে ভাবতে অরুণা আলো নিভিয়ে, ঘরের দরজা বন্ধ করে শুয়ে পড়ল। অন্ধকার। রজত জেগে থাকতে যেসব কথা অরুণা স্পষ্ট ভাবতে পারে না, এবার সেগুলো অরক্ষিত শহরের ওপর শত্রুর গুলি-গোলার মত ঝাঁপিয়ে পড়বে। অরুণা চলে যাবে সিমলা পাহাড়ের সেই ঘোমটা-ঢাকা আকাশের নীচে, কলকাতার বাড়ির ছাদের নিভৃত কোণটিতে, কিংবা ওয়ালটেয়ারের সমুদ্রতটে, চিলকা হ্রদের মাঝখানে দ্বীপের মত পাহাড়টার ওপর। এই বাড়ি-ঘর, খাট-বিছানা··· কোন কিছুর সঙ্গেই তার সম্বন্ধ থাকবে না।

—'দিদি।'

অন্ধকারের মধ্যে দরজার ওপার থেকে বরুণার গলার স্বর শোনা গেল। আশ্চর্য হয়ে অরুণা উঠে পড়ল। আলোটা জ্বালতে জ্বালতে জিজ্ঞেস করলে, 'কে, বরুণা?'

-'হ্যাঁ দিদি, আমি। একটু দরকার ছিল। দরজাটা খোলো তো।'

দরজা খুলে দেবার পর বরুণা ঘরে ঢুকল।

—'হঠাৎ, এত রাত্রে?'

—'আমি কাল সকালের ট্রেনেই কলকাতায় যাব, তাই বলতে এলাম।'

—'রামচরণ কাকা তোকে নিতে এসেছেন বুঝি?'

—'হ্যাঁ, বাবা ওঁকেই বলে দিয়েছেন।'

—'কেন, তা কিছু বলেননি?'

—'না।'

অরুণা এবার ভাল করে বরুণার মুখের দিকে তাকাল। মিছে কথা

বলার অভ্যাস ছিল না বরুণার, তার মুখের দিকে তাকিয়েই বোঝা গেল সে কিছু একটা লুকোবার চেষ্টা করছে।

—'হঠাৎ তোরই বা যাবার দরকার পড়লো কেন? আমার ভয় করছে বরুণা, তুই যেন কিছু একটা লুকোবার চেষ্টা করছিস।'

—'তোমার এমন অস্থিব হলে চলবে না দিদি।'—একটু ইতস্ততঃ করে বরুণা বললে—'রজতকে মানুষ করে তুলতে হবে।'

—'হবে, আমি জানি। সে আমি পারবোও তোরা দেখিস। কিন্তু সত্যি কথাটা তোকে বলতে হবে। কি হয়েছে অনিলের? ফাঁসি কি হয়ে গেছে?'

—'না। কিন্তু আপিলেব ব্যাপারে কতকগুলো গলদ দেখা দিয়েছে; সে-গুলো শোধবাবাব জন্যে আমায় কলকাতায় যেতে হবে।'

—'তোকে যেতে হবে? কেন?'

—'আদালতে দরখাস্ত করবার জন্যে।'

—'কিসেব দরখাস্ত?'

সঞ্জীবের চিঠিখানা বরুণাব কাছেই ছিল। সঞ্জীব সেখানা অরুণাকে দেখাতে নিষধ করেছিলেন। কিন্তু আর বেশীক্ষণ সেটা সে লুকিয়ে বাখতে পারলে না। বললে, 'বাবার চিঠিখানা পড়ে দেখ, মুখে বলতে পাববো না।'

চিঠিখানা সে অরুণাব হাতে দিল। রুদ্ধনিশ্বাসে সেখানা পড়ে ফেলে বললে, 'তুই একথা বলতে পারবি বরুণা যে, শুভেন্দুর চরিত্র ভালো ছিল না? ঘটনার রাত্রে সে ঝিলের ধারে আমার হাত ধরে টানাটানি কবেছিল? এতবড় মিথ্যে কথা ভগবান সহ্য করতে পারবেন?'

বরুণা স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, 'উকিল-ব্যারিস্টাররা বলছেন, এ-ছাড়া জামাইবাবুকে বাঁচাবার আর কোনো পথ নেই।'

অরুণা উদ্দীপ্তকণ্ঠে বললে, 'না থাক, তার কোন দরকারও নেই

বরুণা। এত বড় অন্যায়…এ আমি হতে দেবো না। পরপারে বসে শুভেন্দুর আত্মা শিউরে উঠবে, কি জবাব দিবি তাকে ?'

—'আমি সমস্ত সন্ধ্যা ধরে ভেবেছি দিদি। মরা মানুষ বাঁচে না, কিন্তু যাদের বেঁচে থাকতে হবে তাদের ইচ্ছে করে মরলে চলে না।'

—'বুড়ী গিন্নির মত যখন তখন উপদেশ দেবার চেষ্টা করিসনি বরুণা। ওগুলো আমার ভাল লাগে না। মানুষের বিবেক বলে যদি কোথাও কিছু থাকে তাহলে ঈশ্বর তাকে কখনোই ক্ষমা করবেন না।'

বরুণা একটু হাসবার চেষ্টা করে বললে, 'উপদেশেব মাত্রাটা তোমারই বেশী হয়ে উঠছে দিদি, একেবারে ছেলেদেব পড়ার বইয়ের নীতিকথার মত। আমি যাচ্ছি বাবার ইচ্ছেমত কাজ করতে ; ভালমন্দ, স্বর্গ-নরক · এত সবের বিচার আমি নাই বা করলাম।'

অরুণা আহত, ক্ষিপ্ত, উদ্ধত কণ্ঠে বলে উঠল, 'কিন্তু আমি এ-সংসাবে মুখ দেখাবো কি কবে ? আমায় কি তোরা একদণ্ড মাথা উঁচু করে থাকতে দিবি না, রাশি রাশি অন্যায়ের বোঝা জড়ো হবে কি শুধু আমারই মাথার ওপর ? এ আমি সহ্য করতে পারবো না বরুণা, কিছুতেই না …..'

—'তোমার পাগলামি শোনবার সময় আমার নেই দিদি। আমাকে আজ রাত্রিতেই সব গোছগাছ করে নিতে হবে। আমি চললুম।'

বরুণা অরুণার উত্তরের জন্য অপেক্ষা না কবে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল। আর অরুণা ? রজতের মাথাব ওপর একটা হাত রেখে সে স্তব্ধ প্রস্তরমূর্তির মত দাঁড়িয়ে রইল।

সকালের ট্রেনেই রামচরণ আর বরুণা কলকাতায় চলে এল।

বরুণা জীবনে আর কোনদিন কলকাতায় আসেনি। কলকাতার

পথে পথে, বাড়িতে, গাড়িতে এবং জনসমারোহে প্রতিমুহূর্তে তার জন্যে নব নব বিস্ময় অপেক্ষা করছিল। কিন্তু যে জন্যে সে কলকাতায় এসেছে তারই চিন্তার কাছে এই বিপুল বিস্ময় একেবারে ম্লান হয়ে গেল, কোনরকম রেখাপাতই করতে পারল না।

সঞ্জীব নিজের নির্দিষ্ট ঘরটিতে সাগ্রহে বরুণার আগমন প্রতীক্ষা করছিলেন। হাতে একখানা খবরের কাগজ থাকলেও তাঁর চোখটা ছিল ঘড়ির কাঁটার দিকে।

রামচরণের পেছনে পেছনে বরুণা ঘরে ঢুকতেই তিনি চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন এবং ছেলেমানুষের মত বরুণাকে বুকের মধ্যে নিলেন।

- 'তুমি আসবে একথা আমি জানতাম মা। তবু, মনে মনে কামনা করেছিলাম, অন্ততঃ এই বাবদা তুমি বাপের জুলুম অমান্য করো।'

সঞ্জীবের বুকে মুখ লুকিয়ে বরুণা শুধু বলতে পারল—'আমি পারবো বাবা। আমি জানি সে আমাকে ভুল বুঝবে না।'

বরুণার মাথায় একটা হাত রেখে সঞ্জীব বললেন, 'মৃত্যুর পরেও যদি মানুষের আত্মা থাকে, শুভেন্দু তোকে আশীর্বাদ করবে বরুণা।'

বরুণা যথারীতি এফিডেবিট করল, আদালত কমিশনে তার জবানবন্দী গ্রহণ করলেন।

তারপর নির্দিষ্ট সময়ে আপিলের শুনানি আরম্ভ হল হাইকোর্টে।

সম্ভ্রান্ত পরিবারের কলঙ্ককথা বাঙলাদেশে যতখানি মুখরোচক, এমন আর কিছুই নয়। অনিলেব মামলায় জনসাধারণের মধ্যে আগেই যথেষ্ট আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছিল। আপিলের শুনানির সময় সেই আগ্রহটা যেন আরও বেশী আত্মপ্রকাশ করল। উকিল-ব্যারিস্টার আর কৌতূহলী সাধারণ লোকে আদালতের ঘর ভরে গেল। ভবশঙ্কর

চৌধুরী দলবল নিয়ে যথারীতি হাজির হলেন, দর্শকদের আসনে সঞ্জীব, বরুণা এবং রামচরণকেও দেখতে পাওয়া গেল।

অনিলের পূর্বজীবনের সমস্ত কথা একে একে বর্ণনা করে আসামীর পক্ষের ব্যারিস্টার রূপে সিদ্ধার্থ বলল, 'Your Lordship, আসামীর অতীত জীবনের কথা আমি আপনার কাছে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত খুলে বলেছি। এ থেকে অন্ততঃপক্ষে এটুকু আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন যে আসামী স্বভাবের দিক থেকে খুনী বদমায়েস বা habitual criminal নয়। সে সুরুচিসম্পন্ন শিক্ষিত ব্যক্তি, সে শিল্পী, সে আর্টিস্ট। তার জীবনে কুৎসিত বা অসুন্দরের কোন স্থান নেই। তবু সে নরহত্যার মত বীভৎস একটা কাজ করলো কেন? সে কথা বুঝতে হলে আদালতের কেবল জুরিসপ্রুডেন্সের পাতাগুলোর দিকে দৃষ্টি রাখলে চলবে না। আইনের কেতাবের বাইরে Criminal Procedure Code-এর সমস্ত ধারা ও উপধারার বাইরে, যে পৃথিবী নিয়ত পরিবর্তিত হচ্ছে,—মানুষকে এক মুহূর্ত সুস্থ, সুন্দর আর স্বাভাবিক থাকতে দিচ্ছে না, তার প্রতি আদালতকে দৃষ্টি দিতে হবে। অনিল বোসকে আপনারা কেবল মামলার আসামী হিসেবে দেখবেন না। সে আধুনিক মানুষের প্রতিনিধি, এ যুগের প্রতীক। তাদের ভাল হবার বাসনা আছে, জীবনকে সুন্দব করে তোলবার কামনা আছে, কিন্তু উপায় নেই। সন্দেহ, সংশয় আর অবিশ্বাস এদের মনকে ছেয়ে ফেলেছে। এরা বিশ্বাস করে সহজে, সে বিশ্বাস ভেঙে যায় তার চেয়েও সহজে। এ থেকে পালাবার পথ তাদের নেই। এ কথাগুলো স্মরণ রাখলেই বিচারপতি বুঝতে পারবেন যে ঘটনার দু-মিনিট আগে পর্যন্ত তার মনে নরহত্যার কোন কল্পনাই দেখা দেয়নি।

ঘটনার দিন সকালে মানসিক উন্মত্ততার সময় একবার আত্মহত্যার কথা তার মনে উদয় হয়েছিল। পিস্তলটা সে আলমারি থেকে বার করেছিল সেই জন্যেই। কিন্তু কয়েক মিনিট পরেই তার

মত বদলে যায়। তাড়াতাড়িতে সে পিস্তলটা পকেটেই ফেলে রেখেছিল এবং সেই জামা পরেই চলে এসেছিল বেগমপুরে। আগের দিন অধিক রাত্রি পর্যন্ত মদ্যপানের ফলে তার মনের অবস্থাটা ঠিক স্বাভাবিক ছিল না। তার ওপর সমস্ত দিন স্নান ও আহারের সময় পর্যন্ত পায়নি। যে অবস্থায় সে পিস্তল বার করে শুভেন্দুকে গুলি করে, তাকে সাময়িক উন্মত্ততা বলতে পারেন, temporary insanity, I mean. হঠাৎ বিলের ধারে শুভেন্দুকে তার স্ত্রীর কাছে অত্যন্ত compromising অবস্থায় দেখে সমস্ত হিতবুদ্ধি সে হারিয়ে ফেলেছিল। আসামীর মত দুর্বলচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে এই ভাবে ক্ষেপে ওঠা মোটেই বিচিত্র নয়। মৃত ব্যক্তির স্ত্রী তাঁর বিবৃতিতে স্বীকার করেছেন যে তাঁর পরলোকগত স্বামীর চারিত্রিক একনিষ্ঠতার সম্বন্ধে সন্দেহ করবার যথেষ্ট কারণ ছিল। এরপর দোষের বোঝাটা কেবল আসামীর ঘাড়ে চাপিয়ে দেওয়াটা কিছুতেই সংগত হতে পারে না। আমি সেই জন্যেই মৃত্যুদণ্ড রহিত করবার জন্যে বিচারপতিকে অনুরোধ করছি।'

আসামী পক্ষের ব্যারিস্টারের বক্তব্য এখানেই শেষ হল। আদালতের প্রকাণ্ড ঘরখানা মিনিটখানেক একেবারে স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপরেই সরকার পক্ষের কাউন্সেল উত্তেজিতভাবে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, 'The statement of the deceased's wife is an after-thought, Sir. No mention of it was made during the first stages of the case, my Lord!'

সিদ্ধার্থ নিজে। বক্তব্য শেষ করে বসে পড়েছিল। প্রসিকিউশন কাউন্সেলের কথা শুনে সে আবার উঠে দাঁড়িয়ে বললে, 'আসামী এবং নিহত ব্যক্তির স্ত্রী দুজনেই এতদিন তাঁদের পারিবারিক কলঙ্কের কথা আদালতে প্রকাশ করতে রাজী হননি, সেই জন্যেই আসামীপক্ষ সমর্থনের কোন ব্যবস্থা প্রথমে করা হয়নি। একজন হিন্দুনারী অকারণে

তাঁর স্বামীর বিরুদ্ধে, প্রকাশ্য জনসমাজে এতবড় কলঙ্ক আরোপ করবেন, এ কথা কি আদালত বিশ্বাস করতে পারেন ? আমি তাঁর দরখাস্ত বহু-পূর্বেই আদালতে পেশ করেছি।'

দর্শকদের আসনে বরুণা পাংশু বিবর্ণমুখে থরথর করে কাঁপছিল। সঞ্জীব পিঠে হাত রেখে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছিলেন। আসনগুলির অপর প্রান্ত থেকে ভবশঙ্কর চৌধুরী হঠাৎ দাঁড়িয়ে পাগলের মত চীৎকার করে বললেন, 'মিথ্যে কথা হুজুর, সমস্ত মিথ্যে কথা। এ কখনও সম্ভব হতে পারে না। আসামী যাকে খুন করেছে সে আমারই ছেলে। পরস্ত্রীর মুখের দিকে সে কখনো কু-ভাবে তাকাতে শেখেনি। যদি ধর্ম থাকে তাহলে আমার ছেলের বউ আদালতে দাঁড়িয়ে সে-কথা অস্বীকার করুন। তিনি এই আদালতেই আছেন।'

সিদ্ধার্থ আপত্তি করে বললেন, 'I hope your Lordship will stop this unnecessary interference !'

বিচারপতি বললেন, 'Order order, or I will clear out all outsiders'.

ভবশঙ্কর হতাশ হয়ে বসে পড়লেন।

সিদ্ধার্থ বললে, 'আদালত মৃত ব্যক্তির স্ত্রীর জবানবন্দী গ্রহণ করেছেন। সুতরাং তাঁর বক্তব্য সম্বন্ধে সন্দেহের কোন কথাই উঠতে পারে না। তাঁকে অবিশ্বাস করতে হলে হিন্দুর স্ত্রী সম্বন্ধে আমাদের আদর্শকেই অবিশ্বাস করতে হয়। কত দুঃখে, কত বেদনায় তাঁকে এই কথাগুলি স্বীকার করতে হয়েছে, বিজ্ঞ বিচারপতি একটু চিন্তা করলেই তা অনায়াসে উপলব্ধি করতে পারবেন। এ বিষয়ে আমার আর কোন কথাই বলবার নাই।'

সিদ্ধার্থ চেয়ারে বসে রুমাল দিয়ে কপালের ঘাম মুছতে লাগল। আদালতে দাঁড়িয়ে এতবড় মিথ্যা কথা সে আর কোনদিন বলেনি। মনে হল, তার গলার ভেতরটা পর্যন্ত যেন শুকিয়ে গেছে।

বিচারপতি সরকারী কাউন্সেলের দিকে চেয়ে বললেন, 'Have you anything more to say, Mr. Bose?'

প্রসিকিউশন কাউন্সেল বললেন, 'Nothing much, my Lord! কি উদ্দেশ্যে এই অপরাধ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, আদালত সেইটুকু বিশ্লেষণ করে দেখবেন, এইটুকু মাত্র অনুরোধ। আসামী এবং নিহত ব্যক্তি জমিদার সঞ্জীব রায়ের বিরাট সম্পত্তির সমান অংশীদার; মৃত ব্যক্তি অপুত্রক ছিল। ঘটনার পূর্বে আসামীর আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হয়ে পড়ে। সেই অবস্থায়, ভবিষ্যতে সঞ্জীব রায়ের সমস্ত সম্পত্তিটাই যাতে তার হাতে এসে পড়ে সেই জন্যে মানসিক উত্তেজনায় এই অভিনয় করা তার পক্ষে মোটেই অস্বাভাবিক নয়। And I have finished, my Lord.'

জজ বললেন, 'Thank you Mr. Bose. Judgement is reserved till Wednesday next.'

সঞ্জীবের প্রতীক্ষার পথ বেয়ে বুধবারও এসে পড়ল। কিন্তু সেদিন তিনি আদালতে গেলেন না। যদি নিম্ন আদালতের রায়ই বজায় থাকে, আপিল ফেঁসে যায়? ভবশঙ্কর চৌধুরীর কাছে সঞ্জীব তাহলে মুখ দেখাবেন কি করে?

বেলা দশটার পর থেকে তিনি বরুণাকে সঙ্গে নিয়ে অনিলের বাড়ির ড্রয়িংরুমে টেলিফোনটার পাশে বসে রইলেন। রামচরণ আদালতে গেছে, রায় বেরোলেই ফোন করবে।

বেলা বারোটা বেজে গেল, তখনও রামচরণের টেলিফোন এল না। সঞ্জীব অস্থির হয়ে পড়লেন।

বরুণার দিকে চেয়ে বললেন, 'রামচরণটা বুড়ো হয়ে মরতে চললো

বরুণা, কিন্তু তাকে একটা কাজের ভার দিয়ে নিশ্চিন্ত হবার উপায় নেই। বেলা একটা বাজতে চললো, এখনো বাবুর খবর দেবার ফুরসত হল না।'

বরুণা বললে, 'জজ এখনো হয়তো রায় দেননি বাবা।'

—'না, দেননি। রায় ঠিকই দেওয়া হয়েছে। তোমার রামচরণ কাকাই হয়তো কোন চায়ের দোকানে ঢুকে আড্ডা জমিয়ে তুলেছেন।'

—'তাহলে আপনি নিজে গেলেই সব দিকে ভালো হত বাবা।'

'আমি? নাঃ, অতো উৎসাহ আমার নেই। সাধ্যমত চেষ্টা করলাম, এখন যা হয় হোক।'- নিস্পৃহভাবে কথাটা বলে তিনি উত্তেজনা বোধ করছিলেন, এমন সময় ফোনটা ঝনঝন করে উঠল।

সঞ্জীব উঠলেন না। বরুণাই টেলিফোনটার কাছে এসে অস্থিরভাবে রিসিভারটা কানে তুলে ধরল।

—'হ্যালো। কে, রামচরণ কাকা?·· হাঁ, আমি বরুণা, বাবা পাশে রয়েছেন।···বলুন, বলুন।· ফাঁসির হুকুম রদ হয়েছে?···বারো বছর জেল?···সত্যি · আর কিছু?···ও, আসছেন আপনি?···হ্যাঁ, এখুনি চলে আসুন।···আচ্ছা।'

বরুণা রিসিভারটা রেখে দিল।

সঞ্জীব স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। জীবনে আর কিছু করবার নেই। ভবশঙ্কর চৌধুরীর চেষ্টা অন্ততঃ কিছুটা নিষ্ফল করা গেছে, এইটুকুই এখন বেঁচে থাকবার একমাত্র সান্ত্বনা। আর সব যে কে সেই রয়ে গেল। অনিল বাড়ি ফিরবে বার বছর পরে। বরুণার সীমন্তের দিকে চোখ মেলে চাওয়া যাবে না।

বরুণা সঞ্জীবের চেয়ারের পেছনে একটা হাত রেখে পাথরের মূর্তির মত দাঁড়িয়ে ছিল। তার ভাবনা-চিন্তাগুলো যে কতদূরে চলে গেছে, চোখের দিকে চেয়ে তার নাগাল পাবার উপায় নেই

পাঁচ মিনিট কাটল এই ভাবে।

তারপর সঞ্জীব হঠাৎ উৎসাহের ভাব দেখাবার চেষ্টা করে বললেন, 'বুদ্ধিমান ছোকরা এই সিদ্ধার্থ! এক চালে জজের মাথা ঘুরিয়ে দিলে! আমি তখনই সিদ্ধার্থকে বলেছিলাম…'

কথা বলতে বলতে বরুণার মুখের দিকে চেয়ে সঞ্জীব থেমে গেলেন। হাসি, কান্না, অভিমান, শোক, দুঃখ ও বিরাগের অতীত এমন অপরূপ করুণ মুখশ্রী সঞ্জীব আর কখনও দেখেননি। তিনি যে কত বড় অপরাধ এই মেয়েটিকে দিয়ে করিয়েছেন সে কথাটাও আজ যেন তিনি সর্বপ্রথম ভাল করে বুঝতে পারলেন।

বরুণাকে কাছে টেনে নিয়ে তিনি বললেন, 'ও-কথা ভাবতে নেই মা, ভাবতে নেই। আমি এতকাল খাঁটি হয়ে চলবার চেষ্টাই করেছিলাম বরুণা, কিন্তু শুভেন্দু যেদিন খুন হল সেদিন আমার মনে হয়েছিল, পৃথিবীতে কোন কিছুরই বুঝি মূল্য নেই—না নীতির, না ন্যায়ের, না ধর্মের। তাই তো তোকে পর্যন্ত এত বড় পাপের মধ্যে টেনে নিয়ে গেলাম। আমি যে আর ঈশ্বরকেও বিশ্বাস করতে পারবো না বরুণা।'

বুড়ো বাপের বাহুবন্ধনের মধ্যে বরুণা যেন একেবারে ভেঙে পড়ল। সঞ্জীব তার এলোমেলো, রুখু চুলগুলির ওপর আস্তে আস্তে হাত বুলোতে লাগলেন।

হাইকোর্টের রায়ের মর্ম একদিন জেলের মধ্যেও পৌঁছল। সে খবর শুনে অনিল একটু ক্ষীণ হাসল আর নিজের গলাটায় একটু হাত বুলিয়ে দেখল। ফাঁসির বদলে বার বছর ধরে এই জেলে। বার বছরের প্রত্যেকটি দিন ও রাত্রির প্রতি মুহূর্তে ধীরে ধীরে মৃত্যুপথ যাত্রা!…চমৎকার হুকুম!

কলকাতা থেকে সঞ্জীব বরুণাকে নিয়ে বেগমপুরে ফিরে গেলেন। খবরটা অরুণা আগেই পেয়েছিল। কিন্তু বরুণা যখন বাড়িতে ফিরে এল, অরুণা তার মুখের দিকে চাইতে পারল না। অরুণার মনে হল ছোট বোনের কাছে সে হেরে গেছে। আর সে পরাজয়ের কলঙ্ক কোনদিনই ঘুচবে না।···

দশ বছর পরে আবার একদিন গল্পের যবনিকা উঠল। মানুষের জীবনের ইতিহাসে এই কটা বছর আর কতটুকু সময়।

এই সময়টুকুর মধ্যে একজনের কথাই বিশেষ করে বলবার। সে অনিল নয়, সঞ্জীব নয়, অরুণা নয় কিংবা বরুণা পর্যন্তও নয়, সে মানুষটির নাম রজত। এই পরিবারের দুঃখ, গ্লানি ও বেদনাকে আড়াল করে রজত ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে। মাস কয়েক আগে সে এগারোয় পা দিয়েছে।

মা মাসী আর দাদামশায়ের অসম্ভব সতর্ক স্নেহদৃষ্টির মধ্যে রজত ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠেছে।

সঞ্জীব তাকে দেখছেন তাঁর বিরাট সম্পত্তির একমাত্র ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হিসেবে। বরুণা জীবনে যে স্নেহস্পর্শের সন্ধান পায়নি, রজতকে কাছে পাবার সুযোগে সেটাই ভুলে থাকবার চেষ্টা করছে।

আর অরুণা ?

সে ছেলেকে মানুষ করে তুলছে। এমন করে ছেলে মানুষ তার আগে বোধ হয় পৃথিবীতে কেউ করেনি।

স্কুলে সেদিন রজতকে কে বলেছিল, 'তোর বাপ তো একটা খুনী বদমাইস, এখনও জেলে পচছে। জানিস ?'—তাই মহকুমার সদর শহরের স্কুল থেকে মোটরে বাড়ি ফেরবার পর রজত অরুণাকে জিজ্ঞেস করেছিল, 'হ্যাঁ মা, একথা কি সত্যি ?'

অরুণা আর বরুণা পাশাপাশি বসে কি একটা কাজ করছিল। অরুণা একবার বরুণার মুখের দিকে চেয়ে নিতান্ত সহজকণ্ঠে রজতকে বলল, 'তারা মিছে কথা বলেছে রজত।'

এতদিন বাড়ির প্রত্যেকটি প্রাণীর অসাধারণ সতর্কতায় পিতৃ-

পরিচয়টা রজতের একেবারে অগোচরেই থেকে গিয়েছিল। কিন্তু স্কুলের ছেলেটির কাছে এই কথাটা শোনবার পর সমস্ত মনটা তার বিক্ষুব্ধ ও উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। তাই অরুণার কথায় সে সহজে নিশ্চিন্ত হতে পারল না। পালটা প্রশ্ন করল।

—'বাবা তাহলে কোথায় ?'

অরুণা তেমনই সহজভাবে বলল, 'বারো বছর আগে তিনি বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তিনি বেঁচে আছেন কি নেই, তাও কেউ বলতে পারে না, সম্ভবতঃ নেই।'

বরুণা হাতেব কাজ ফেলে অরুণার দিকে চাইল। অরুণা তার স্বর একটু কঠিন করে বলল, 'তোকে বাবা বোধহয় খুঁজছেন বরুণা, যা তো দেখে আয় একবার।'

কথাটা অরুণার অনুমান মাত্র, বরুণাকে এড়াবার অজুহাত শুধু। তবু অনিচ্ছাসত্ত্বেও বরুণা উঠে গেল।

রজত তখনও স্তম্ভিতেব মত দাঁড়িয়ে ছিল।

অরুণা বলল, 'আমি সিঁদুর পরি না, গয়না পরি না···এ থেকেও কি কিছু বুঝতে পারো না, বোকা ছেলে ?'

বোকা ছেলে বোধ হয় এতক্ষণে বুঝল। কারণ রজত বড় হবার পর অরুণা সত্যিই সীমন্তে সিঁদুর পরেনি, কেউ কোন দিন তাকে ভাল একখানা কাপড় পর্যন্ত পরতে দেখেনি। তার বহুদিনের আত্ম-বিপর্যস্ত মাথাব চুলে, চোখের নিস্পৃহ দৃষ্টিতে অদ্ভুত ও কঠোর বৈরাগ্যের ইঙ্গিত। সেদিকে তাকিয়ে তার কথা অবিশ্বাস করবে কে ?

বরুণা কিন্তু একটু পরেই ফিরে এসে বলল, 'এ তুমি কি করলে দিদি ?'

অরুণা বলল, 'এ ছাড়া আমার উপায় নেই বরুণা। আমি তোদের সকলের কাছে মাথা হেঁট করে থাকতে পারব না।'

তারপর আরও কটা মাস কেটে গেল।

সুর ও বীণা

সঞ্জীব রায় অসুখে পড়লেন। দুঃখে ও দুশ্চিন্তায় ভেতরটা তাঁর অনেক আগেই জীর্ণ হয়ে পড়েছিল। কাজেই আয়ুর প্রদীপ নিভে আসতে খুব বেশী দেরি হল না।

সঞ্জীবের শয়নঘরে বাঙলার নানা পূজাপার্বণের তৈলচিত্র, সেকালের পটুয়াদের আঁকা চিত্রপট চারিদিকে সাজান ছিল। একদিন অনেক রাত্রিতে ঘরের ছবিগুলোর দিকে তাকাতে তাকাতে সঞ্জীব বললেন, 'ওগুলো সব সরিয়ে দে নিমাই, ঘরটা একটু ফাঁকা হোক।'

সঞ্জীব ভুল বকছেন মনে করে নিমাই ইতস্ততঃ করতে লাগল। কিন্তু ভুল সঞ্জীব করেননি। সঞ্জীব এবার প্রায় চিৎকার করে বললেন, 'রামচরণ, নিমাই কোথায় গেল এরা সব ? কেউ কি আমার হুকুম শুনতে পায় না ? নিয়ে যা ছবিগুলো সরিয়ে, পাথরের মেঝেতে ফেলে ভেঙে চুরমার কবে ফেল ওগুলোকে।'

নিমাই এবাব ভয়ে ভয়ে ছবিগুলো নামাতে আরম্ভ করল, অরুণা আর বরুণা দুজনেই খাটের মাথার দিকে বসে ছিল। সঞ্জীব দুজনেব মুখের দিকে কিছুক্ষণ একদৃষ্টিতে চেয়ে থেকে বললেন, 'ভাগ্য তোদেব ঠাট্টা করে ঠিক একজায়গায় ফেলে রেখে গেছে—দেখিস, এ গাঁট যেন না খোলে।'

হঠাৎ তিনি হোহো করে হাসতে লাগলেন।

সেই রাত্রিতেই বড় দুজন ডাক্তার এল। পরীক্ষা শেষ করে তাঁরা রায় দিলেন, জ্বর-বিকার। সঞ্জীবের মাথায় আইস-ব্যাগ চড়ল। ওষুধ এল রাশি রাশি। রাজকীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা আরম্ভ হল।

শেষ রাত্তিরে সঞ্জীব চীৎকার করে বললেন, 'রক্ত!'

বরুণা এবং অরুণা দুজনেই আশ্চর্য হয়ে তাঁর মুখের দিকে তাকাল।

সঞ্জীব আবার বললেন, 'এত রক্ত এল কোথা থেকে ? আঁচল দিয়ে মুছিয়ে নে বরুণা।'

সঞ্জীবের তুই মেয়ে আঁচলে মুখ ঢাকলেন।

শেষ রাত্তিরের অপরিস্ফুট পরিবেষ্টনীর মধ্যে ঘরের এক কোণে স্নিগ্ধ তৈলপ্রদীপ জ্বলছে। সঞ্জীবের মাথার দিকের জানালাটা খোলা। সঞ্জীব একাগ্র দৃষ্টি দিয়ে আকাশের গায়ে কি যেন খুঁজছিলেন। এই বিরাট রায়বাড়ি, তার দেড় শতাব্দীর ইতিহাস, অভ্যুত্থান ও ঐশ্বর্যের বিচিত্র কাহিনী, ক্ষমতমা-দমত্ততা ও তুঃখশোকের করুণ উপাখ্যানের সঙ্গে তাঁর যোগসূত্র ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে আসছে। বাতাসে প্রদীপশিখা কেঁপে কেঁপে উঠছে, আর তারই ছায়া পড়েছে দেওয়ালের গায়ে। সঞ্জীব অরুণার মুখের দিকে চেয়ে হঠাৎ বললেন, 'সে শালা কোথায়? নবাবের নাতি—ঘুমুচ্ছে বুঝি? ডাক তো একবার।'

অরুণা উঠে গিয়ে রজতকে ডেকে আনল। ঘুম থেকে উঠে সে ভাল করে কিছুই বুঝতে পারছিল না, মায়েব কোল ঘেঁষে হতভম্বের মত দাঁড়িয়ে রইল।

সঞ্জীব বিহ্বল-দৃষ্টিতে তার মুখেব দিকে চেয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। রজতের সমস্ত শরীরে অনিলেব প্রখর ব্যক্তিত্বের ছায়া, চোখে ঠিক অনিলের মত তুরবগাহ স্বপ্নালসদৃষ্টি। মাথায় একরাশ ঝাঁকড়া চুল।

সঞ্জীব তার একটা হাত বুকের ওপব টেনে নিয়ে বললেন, 'আমি চললাম দাতু, ডাক এসে গেছে। মা আর মাসী তুজনেই রইল। তুবেলা তুমুঠো খেতে দিস তাদের; ঘাড় ধরে তাড়িয়ে দিস না যেন।'

শঙ্কিত, সন্ত্রস্ত রজত কিছুই বুঝতে না পেরে হঠাৎ কেঁদে ফেলল। সঞ্জীব তার চুলগুলোর ওপব হাত রেখে বিড়বিড় করে কি বকতে লাগলেন।

একটা অস্বস্তিকর স্তব্ধতা কিছুক্ষণ ঘরটাকে জুড়ে রইল।

তারপর সঞ্জীবের মনে হল, তাঁর ধবধবে সাদা বিছানার চারপাশে

ঘরের সিলিং থেকে মেঝে পর্যন্ত গাঢ় লাল রঙের ঢেউ একেবারে উত্তাল হয়ে উঠেছে।

ধড়মড় করে উঠে বসে তিনি বললেন, 'রক্ত!'

ডাক্তার ও রামচরণ ধরাধরি করে তাঁকে বিছানায় শুইয়ে দিল। হঠাৎ দমকা বাতাসে বাইরের বাতিদানের আলোটা এবং ঘরের দীপশিখাটুকু পর্যন্ত নিভে গেল। সঞ্জীবের শিথিল হাত দুটি লুটিয়ে পড়ল বিছানার ওপর।

তারপর মিলিত নারীকণ্ঠের আর্তনাদ।

সঞ্জীবের মৃত্যুও প্রতিদিন জীবনধারণের জঞ্জালের কাছে ম্লান হয়ে এল।

জীবিত মানুষের আয়ুব সমুদ্রে দিন ও রাত্রির আরও কয়েকটা বুদ্বুদ মিলিয়ে গেল। ধুলো জমতে লাগল বেগমপুরের জমিদার বাড়ির মেহগনি কাঠের সিঁড়িতে, গ্যারেজে মোটরগুলো কভার-ঢাকা হয়ে পড়ে রইল। ইলেকট্রিক ডায়নামো পর্যন্ত বন্ধ হয়ে গেল। অযত্ন আর অবহেলায় রায়েদের সাজান বাগান আগাছায় ভবে উঠল, ঝিল শুকিয়ে শীর্ণ হল। অত বড় বাড়ির মধ্যে মাত্র তিন চারটি প্রাণী, কতটুকু স্থানই বা এক একজনেব জন্যে প্রয়োজন হয়? বাড়ির খিলানে খিলানে কড়িতে কড়িতে চড়ুই, কাক আর শালিকে বাঁধল বাসা। কেউ সেগুলোকে তাড়াল না।

বরুণা বসে আছে তাব নিভৃত মনের গহন তপভূমিতে; অরুণা আছে স্মৃতির পথহীন অবণ্যে আর রজত আছে তার বই-খাতা পেনসিলের নতুন নতুন বিস্ময় নিয়ে। রামচবণ এই তিনটি মানুষকে আগলে আছে বুড়ো যখের মত। অনিল যতদিন কলকাতার জেলে ছিল ততদিন সে মাঝে মাঝে সেখানে গিয়ে খোঁজ-খবর এনেছে, দেখা-সাক্ষাৎও করেছে মধ্যে মধ্যে। তারপর তাকে বদলী করা হয়েছে বাঙলার অপর প্রান্তের কোন্ এক জেলে। সঞ্জীবের মৃত্যুর আগেই একখানা পোস্টকার্ড লিখে সে খববটা অনিল দিয়েছিল। মাঝে মাঝে এক একটা পোস্টকার্ড এখনও আসে অরুণার নামে। অরুণা সেগুলিকে লুকিয়ে রাখে রজতের দৃষ্টি ও নাগালের বাইরে। অতদূরে গিয়ে বুড়ো রামচরণকে কেউ অনিলের সঙ্গে দেখা করে আসতে বলে না, যাওয়াও হয় না রামচরণের।

বৈচিত্র্যহীন আরও কয়েকটা মাসকে কে যেন দুর্বহ বোঝার মত এ বাড়ির মনের ওপর দিয়ে টেনে নিয়ে গেল।

তারপর একদিন বৃষ্টিমন্দ্র মুখরিত এক গভীর রাত্রিতে রায়বাড়ির ঝিলের পাশ দিয়ে অন্দর মহলে যাবার যে পথ, সেই পথ দিয়ে একটি লোককে অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতে ওপরে উঠতে দেখা গেল। অত্যন্ত সন্তর্পণে চোরের মতন পা টিপে টিপে সে অরুণার ঘরের দিকে চলেছিল। বাইরে প্রচণ্ড বৃষ্টি, মেঘের উন্মাদ ডাক, ঝড়ো হাওয়ায় বারন্দার কাঁচের শার্সিগুলো বাদুড়ের মত ঝটপট করছে। কেউ তাকে লক্ষ্য করল না।

লোকটা অরুণার ঘরের দরজায় ধাক্কা দিতে লাগল।

ঘরের ভেতর পাশাপাশি দুটো খাট; একটা ছোট আর একটা বড়। রজত আর অরুণা খাট দুটোতে ঘুমুচ্ছিল। দরজায় ঘন ঘন করাঘাতের শব্দে অরুণার ঘুম ভেঙে গেল। কান পেতে কিছুক্ষণ সে শব্দটা ভাল করে শোনবার চেষ্টা করল।......স্পষ্ট তারই ঘরের দরজায় করাঘাত। হয়ত বরুণা উঠে এসেছে মনে করে সে তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠে পড়ল। কিন্তু দরজা খুলে দিতেই ঢুকল বৃষ্টির ছাট, ঝড়ের ঝাপটা এবং তার পেছনে পেছনে অনিল। বিস্ময়ে অরুণা যেন কিছুক্ষণের মত নির্বাক ও নিশ্চল হয়ে গেল। তারপর কোনরকমে পেছিয়ে এসে, খাটের বাজুটা ধরে ফেলে বলল, 'তুমি!'

অনিল বলল, 'হ্যাঁ, আমি। ভদ্রভাবে থাকলে জেলের কর্তারা বছরে কটা দিন দণ্ড মকুব করে। তাই কয়েকটা মাস আগেই বেরিয়ে এলাম। চিঠি পর্যন্ত লেখবার সময় হয়নি।'

ঘরের মধ্যে জলের ছাট আসছে দেখে অনিল দরজাটা বন্ধ করতে গেল। অরুণা একটু অগ্রসর হয়ে বলল, 'বন্ধ কোরো না, চলো আমরা বাইরে যাই।'

—'এই বৃষ্টিতে ? তোমার গা ভিজে যাবে।'

—'তা হোক। তুমি বাইরে এস।'

—'কিন্তু...আমি ঠিক বুঝতে পারছি না অরুণা।'

—'বোঝবার কিছু নেই। রজত উঠে পড়বে।'

'কে রজত! কই...?'

—'আমার ছেলে।'

ছোট খাটটির উপর নিদ্রিত রজতের দিকে চেয়ে অনিল বলল, 'আমাদের নয়?'

অরুণা বলল, 'জানি না। তুমি বাইরে চলো।'

অরুণা বারান্দার দিকে চলল। অনিল পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে আর একবার ঘুমন্ত রজতকে দেখে নিল। তারপর অরুণার পেছনে পেছনে বারান্দায় এসে দাঁড়াল। প্রবল জলের ছাট আর ঝড়ো হাওয়ায় এক মুহূর্ত স্থির হয়ে দাঁড়াবার উপায় নেই। অরুণা নিজের ঘরের দরজাটা এধার থেকে বন্ধ করে দিয়ে অনিলের কাছাকাছি এসে দাঁড়াল।

তারপর দুজনে চেয়ে রইল দুজনার মুখের দিকে। মধ্যে এক যুগের ব্যবধান। অনিলের মনে হল, ভাঙা ভেলায় ভাসতে ভাসতে সে যেন প্রকাণ্ড একটা সমুদ্র পার হয়ে তীরে এসে পৌঁছেচে।

অনিল বলল, 'জেল থেকে ছাড়া পেয়েছি কাল রাত্রিতে। পুলিসের লোক সঙ্গে করে স্টেশনে নিয়ে গিয়ে একখানা টিকিট কেটে ট্রেনে তুলে দিয়েছিল। জীবনে যেন ওই টিকিটখানা ছাড়া আর কিছুরই দরকার ছিল না। আজ সন্ধ্যার মুখে বেগমপুরে এসে নামলাম। কিন্তু গ্রামে ঢুকতে পারিনি। রাত্রি দশটা পর্যন্ত চাষীদের এক পল্লীতে বসে ছিলাম, চিনতে পারেনি কেউ।'

'এখানে?'

—'না, এখানেও কেউ দেখতে পায়নি। কেউ যাতে দেখতে না পায় সেই জন্যেই তো রাত্রির অন্ধকারে লুকিয়ে এলাম। সদরের

দিকে যাইনি। ঝিলের দিকের পাঁচিল ডিঙিয়ে ভিতরে ঢুকতে চেয়েছিলাম। তারপর দেখলাম, ঝিল থেকে উঠে অন্দর মহলে ঢোকবার দরজাটা খোলা; চাকরবাকররা বন্ধ করতে ভুলে গিয়েছিল বোধহয়। সেই পথেই অতিকষ্টে উপরে উঠে এলাম।'

অরুণা এবার চরম মুহূর্তের জন্য নিজেকে তৈরি করে নিল।

—'তোমাকে আজ রাত্রেই ফিরে যেতে হবে অনিল।'

—'কোথায় যাব? কেন?'

—'আস্তে কথা কও। বরুণা কিংবা রজতের ঘুম ভেঙে যেতে পারে।'

—'তোমার মুখের দিকে চেয়ে আমার ভয় করছে অরুণা। আমি কিছুই বুঝতে পারছি না।'

—'কী করে তুমি আবার এ বাড়িতে ঢুকলে? লজ্জা হল না তোমার?'

—'লজ্জা করবার দুর্বলতা আমি কাটিয়ে উঠেছি অরুণা। তুমি আমার সঙ্গে চলো। এ বাড়ির নাম আমি কোনদিন উচ্চারণ করবো না।'

—'সে হবে না অনিল, তোমাকে একা ফিরে যেতে হবে। তুমি কলকাতায় ফিরে যাও; যে বাড়িতে তুমি আমায় বধূ বেশে নিয়ে গিয়েছিলে, সেইখানে। পাওনাদারদের কাছ থেকে উদ্ধার করে সে বাড়িখানা বাবা রজতের নামে কিনে রেখে গেছেন। জেল থেকে ফিরে তুমি সংসার করবে বলে। তোমার বেহালা, তোমার সখের প্রতিটি জিনিস তিনি সেখানে ঠিক আগের মত গুছিয়ে রেখে এসেছেন।'

—'নিঃসঙ্গ সে বাড়িখানা যে আমার কাছে জেলের চেয়েও ভয়ানক হয়ে উঠবে অরুণা, তুমিও চলো সেখানে।'

—'বরুণাকে ছেড়ে আমি যেতে পারবো না। এ বাড়িতে তুমি যে

রক্তের দাগ রেখে গেছ তার ওপর ভালবাসার ফুল আর ফুটবে না অনিল, না এ বাড়িতে, না সেখানে। তুমি ফিরে যাও। আপাততঃ তোমার কত টাকা লাগবে বলো আমি এনে দিচ্ছি।'

অনিল এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বলল, 'নিতান্ত যা কলকাতায় যাবার খরচ, তার এক পয়সা বেশী নয়।'

—'তুমি রাগ করেছ অনিল ?'

—'না। আমি চল্লিশ পেরিয়ে গেছি অরুণা। কিন্তু কী আশ্চর্য অরুণা···মানুষেব কামনা আর কল্পনাকে আজ কত অসহায় মনে হচ্চে।'

—'তুমি আব দেবি কোবো না অনিল। বরুণা রাত্রিতে ভাল করে ঘুমুতে পাবে না, এখনি সে হয়ত উঠে পড়বে।'

—'তাব মুখের কথায় আমাকে ফাঁসিকাঠ থেকে ফিরে আসতে হয়েছে, সে আমি জানি অরুণা। আমি তাকে আর নতুন আঘাত দেব না। আমি যাব। কিন্তু তুমি কোনদিন ভুল করেও আমার কথা ভাববে না ?'

অরুণার মুখে বিচিত্র করুণ হাসির রেখা ফুটে উঠল। ক্লান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'ভাববো। সমস্ত সংসারকে লুকিয়ে আমি তোমার কথা ভাববো। কিন্তু মুখেব দিকে চেয়ে কোনদিন তোমার কাছে যাবার সাহস আমাব হবে না।'

—'আমি কিন্তু কলকাতাব সেই বাড়িতে প্রতিদিন তোমার প্রতীক্ষা করবো—বধূবেশে আবার একদিন সেখানে ফিরে যাবে। মনের অসম্ভব উত্তেজনার মুহূর্তে সেদিন তোমার প্রতি অবিচার করেছিলাম, তাও বুঝি তুমি একদিন ক্ষমা করতে পারবে।'

—'ছেলেমানুষি কোরো না অনিল, চলো তোমায় এগিয়ে দিয়ে আসি।'

—'রজতকে আব একবার দেখতে পাবো না ? এই এগারো বছর ধরে কল্পনায় আমি তাকে বড় করে তুলেছি।'

—'তুমি তার কাছে এলে সে কল্পনা ভেঙে যাবে। আমাদের মনে ভোর হতেই লেগেছে সূর্যাস্তের রং। কিন্তু ওর জীবনে এই তো সূর্যোদয়ের সময়। তুমি কাছে গিয়ে তার সম্ভাবনার আকাশকে অন্ধকার করে দিও না। ও জানে আমার স্বামী বেঁচে নেই; বাড়িতে সবাই তাকে আমার অনুরোধে এক কথাই শিখিয়ে এসেছে। তুমি তার সে ধারণাকে মিথ্যে করে দিও না।'

আকাশের অন্ধকারকে খণ্ডিত করে বিদ্যুৎ ঝলসে উঠল। সেই ক্ষণিক আলোকে অরুণার প্রায়-বৈধব্য বেশের দিকে তাকিয়ে অনিল বলল, 'তাই বুঝি তোমার এই অদ্ভুত সজ্জা!'

অরুণা বললে, 'আমার স্বামীকে আমি তোমার ছেলের কাছে ছোট হতে দেব না অনিল, কোন কারণেই না।'

—'লোকাচারে কি বলবে?'

—'সেদিকে আমি কান দেবো না! সিঁথির সিঁদুর আমি মুছে ফেলবো।'

—'সে কেমন করে পারবে, অরুণা?'

—'যেমন করে বরুণা তার পরলোকগত স্বামীকে আদালতে লম্পট, ব্যাভিচারী বলে প্রমাণ করেছিল, ঠিক তেমনি করে। তুমি বেঁচে আছো, আমার বেঁচে থাকবার পক্ষে এইটুকুই আজ যথেষ্ট। ইচ্ছে করলেই আর আগেকার দিনের মত হয়ে আমি তোমার কাছে ফিরে যেতে পারবো না। চলো অনিল।'

দুজনে আবার ঘরের দিকে চললো। ঝড় তখনও সমানভাবে বইছে; এই দুটি মানুষের মনের ঝড়ই এমন করে আকাশ-বাতাস ছেয়ে ফেলল কিনা কে জানে! ঘরে ঢুকে অনিল রজতের শিয়রে দাঁড়াল। অরুণা সন্তর্পণে আলমারি খুলে বার করল একতাড়া নোট; তারপর ফিরে গেল অনিলের কাছে। অনিল তখন রজতের রেশমের মত কুঞ্চিত কালো চুলগুলি আলগোছে স্পর্শ করে তন্দ্রাচ্ছন্নের

মত দাঁড়িয়ে। অরুণা ফিরে এসে পেছন থেকে অনিলের কাঁধে মৃদু স্পর্শ করল। অনিল ফিরে দাঁড়াল।

অরুণা চাপা গলায় বললে, 'ওকে জাগিয়ো না অনিল। চলে এসো।'

অনিল এগিয়ে গেল দরজার দিকে। অরুণা হাতের নোটগুলো তাকে দিল। অনিল তাড়া থেকে একটিমাত্র নোট নিয়ে বাকীগুলো ফেরত দিল অরুণার হাতে। অরুণা আশ্চর্য হয়ে তার মুখের দিকে চেয়ে রইল।

অনিল নোটগুলোর দিকে চেয়ে বললে, 'একদিন ওগুলোই ছিল জীবনের সবচেয়ে বড়ো উত্তেজনা। কিন্তু আজ আমার কাছে এগুলোর কোন দাম নেই।'

দুজনে বাইরে এসে দাঁড়াল। মাথার ওপর অন্ধকার আকাশ থমথম করছে। বারান্দায় জলের স্রোত। ওধারে বাগানের গাছগুলোয় ঝোড়ো হাওয়াব দাপাদাপি।

অনিল বললে, 'চললাম অরুণা। তোমাব সাধনার জয় হোক।'

অন্ধকারের মধ্যে অরুণার ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠল। কিন্তু কোন কথাই সে বললে না। হাতের মুঠিতে আঁচলের প্রান্তটা প্রাণপণে ধরে থেকে সে কেবল বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রইল।

মুহূর্তের মধ্যে অনিলের আকৃতিটা নীচে নামবার সিঁড়ির মুখে অন্ধকারের মধ্যে হারিয়ে গেল।

ঝড়ের ঝাপটায় অরুণার ঘরের দরজাটা খুলে গিয়েছিল আর সেই ফাঁকে এলোমেলো বাতাস আর বৃষ্টির ছাট ঘরে ঢুকে যেন বিপর্যয় কাণ্ড ঘটিয়ে তুলল। অরুণা যখন ঘরে ফিরে এল তখন ঘরের মেঝে জলে ভাসছে, বিছানার চাদরের একটা প্রান্ত উড়ে চলে গেছে আর একদিকে, খাটের শিয়রের জানালাটা খুলে যাওয়ায় হুহু শব্দে বাতাস আসছে আর্তনাদের মত। চারদিকের এই বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে

রজতের ঘুম ভেঙে গেছে, নিদ্রাজড়িত চোখে সে চেয়ে দেখছে ঘরের চারদিকে। অরুণা ঘরে ঢুকতেই রজত বললে, 'কী হয়েছে মা ?'

—'কিছু হয়নি তো, বাবা। ভীষণ ঝড়বৃষ্টি শুরু হয়েছে।'

রজত বললে, 'ঘরের বাইরে পুরুষমানুষের গলার আওয়াজ শুনতে পেলাম, কে এসেছিল মা ?'

অরুণা রজতের খাটের প্রান্তে বসে হঠাৎ দু-হাত দিয়ে তাকে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরলে। অভিভূত, আচ্ছন্ন কণ্ঠে বললে, 'কেউ তো আসেনি খোকা। ঝড়-ঝাপটা লেগে ভাঙা কাঁচের শার্সিগুলোয় অদ্ভুত শব্দ হচ্ছিল।'

—'তুমি বুঝি তাই দেখতে গিয়েছিলে, না মা ?'

—'হ্যাঁ।'